স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৭ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ২৪ মার্চ, ২০২৫।। ১০ চৈত্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

রাষ্ট্রবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১০ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৪ মার্চ - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

রাজ্যের মানুষ চক্রব্যূহেই কি বসবাস করতে থাকবে?

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিঘায় হিন্দুধর্মের অপমান কেন দিদি? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কেরালায় সরকারি মদতে জঙ্গি সংগঠনের নাম নতুন, কাজ পুরাতন □ টি সতীশন □ ৮

বাংলাদেশে সেনা-অভ্যুত্থানের ছক বানচাল নয়াদিল্লির □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ছাত্র আন্দোলনের নামে বামেদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয় □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

যাদবপুরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বামেরা : তিয়েনআনমেন স্কোয়ার গণহত্যায় চুপ কেন? □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৩

যাদবপুর--যেন একখণ্ড পাকিস্তান □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় সেকাল ও কলুষিত একাল □ সুস্মিতা সেন □ ১৭

বাম-অতিবাম চক্রব্যূহে জাতীয়তাবোধের পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় □ সুদীপ্ত গুহ □ ১৯

ভাতা সংস্কৃতি : ভোটের রাজনীতি নাকি অর্থনীতির আত্মঘাতী ফাঁদ? □ ধর্মানন্দ দেব □ ২০

যাদবপুর আছে যাদবপুরেই : কিন্তু আর কত দিন? □ ড. পঙ্কজ কুমার রায় □ ২৩

এবার যাদবপুরের আরবান নকশালদের বিরুদ্ধেই হোক 'হোক কলরব' □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৫

ধর্মই করে মনুষ্য জীবনে পূর্ণত্ব প্রদান □ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় □ ৩১

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত □ দীপক খাঁ □ ৩৩

নাট্যশাস্ত্রের অঙ্গনে শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য □ বৈশাখী কুণ্ডু □ ৩৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনের অন্ধকার দিকগুলি ঠিক কী রকম □ দেবজিৎ সরকার □ ৩৫

ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তিত হয়ে হলো বিজয় দুর্গ □ কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য □ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৫-৪৬** □ **স্মরণে : ৪৭** □ **বিনোদন : ৪৮** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
৩১ মার্চ
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩১ মার্চ
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীরামনবমী

চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সপ্তম অবতার মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষ্য অনুযায়ী, বারো কলার অধিকারী ভগবান শ্রীরাম। রাজর্ষি শ্রীরামের জীবনচরিত হলো ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনকর্তা শ্রীরামের রাজত্বকাল বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় সুশাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রবিরোধীদের কুনাট্য

ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা পুরুষ হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু বরেণ্য বিপ্লবীর প্রেরণার উৎসও তিনি। বঙ্গভূমিতে স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন শ্রীঅরবিন্দ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ নীলরতন সরকার, মনমোহন ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণচন্দ্র রায় ও সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সহায়তায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। দেশীয় পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং স্বদেশী ভাবধারায় শিল্পায়নের লক্ষ্যে পরিষদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। কলেজ ও ইনস্টিটিউটের একত্রীকরণের মাধ্যমে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর বা উপাচার্য হন ড. ত্রিগুণা সেন।

ইহার পরবর্তী পর্যায়ে ভয়াবহ বাম ও অতিবাম রাজনীতির করালগ্রাসে নিক্ষেপিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদা জাতীয়তাবোধের পীঠস্থানটি পরিণত হয় অপসংস্কৃতি ও নিম্নরুচিসম্পন্ন রাজনীতির আখড়ায়। চরম অরাজক ও হিংসাত্মক নকশালবাড়ি আন্দোলনে বঙ্গের জনজীবন হয় বিপর্যস্ত। সেই লাল সন্ত্রাসের আগুনে দগ্ধ হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও। 'ছাত্র' নামধারী নকশালপন্থী দুর্বৃত্তদিগের আক্রমণে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন। সেই রক্তাক্ত অধ্যায়টি সুপ্রসিদ্ধ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অঙ্গে যেন কলঙ্ক লেপন করে। বাম ও অতিবাম রাজনীতির প্রকৃত চরিত্রটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে হয় উন্মোচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে তাহাদের দখল প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় নৈরাজ্যবাদী বামপন্থীদিগের দল। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে তাহারা ক্ষমতাসীন হইবার পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জুড়িয়া কায়েম হয় তাহাদের নিয়ন্ত্রণ। পরবর্তী চারটি দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র লালদুর্গে পর্যবসিত হয় নাই, একটি মধ্যমেধার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। তথাকথিত মুক্তচিন্তাসম্পন্ন ও প্রগতিশীল বাম ও অতিবাম অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ঘটাইয়াছে পঠনপাঠন ও গবেষণার অন্তর্জলি যাত্রা। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ, আচার্য (অর্থাৎ, মাননীয় রাজ্যপাল), রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং তাঁহাদিগকে আক্রমণের প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়াছে 'শহুরে নকশাল' পরিচয়ধারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বা ছাত্রাবাসে নবাগত ছাত্রদের উপর ভয়াবহ র‍্যাগিং, ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতন, মদ-গাঁজা-ড্রাগস্ ইত্যাদি নিষিদ্ধ মাদক সেবন— সর্বপ্রকার অপরাধ ও কুকর্মের পুরোভাগে রহিয়াছে এই কুখ্যাতরা। তাহাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তির শিকার ও বলি হইয়াছেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। গোপনীয়তার অধিকারের দোহাই পাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নজরদারি এবং সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের বিরোধিতায় তাহারা মুখর হইয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবিরোধী কার্যকলাপের আঁতুড়ঘরও হইয়া উঠিয়াছে বাম-জেহাদি অধ্যুষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সদা উদাসীন রহিয়াছে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারপূর্বক জেহাদি ভাবধারাগ্রস্ত বাম-অতিবাম ছাত্র সংগঠনসমূহ ভারতীয় জাতীয় পতাকায় প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং অহরহ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান তুলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহু বৎসর যাবৎ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ। সম্প্রতি সেই নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত বাম ও অতিবাম সংগঠনগুলির বিক্ষোভের সম্মুখীন হন রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্য প্রশাসনের চরিত্রটি আগাগোড়াই অগণতান্ত্রিক। সমগ্র রাজ্য প্রশাসন দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। শিক্ষামন্ত্রীও অতিবাম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা বিক্ষোভ ও আন্দোলনরত, তাহারাও অতিবাম। ২০২৪ সালে পূর্বতন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর অতিবাম ছাত্র নেতা ইন্দ্রানুজ রায় সামাজিক মাধ্যমে তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে। অথচ দিল্লিতে এই সকল রাষ্ট্রবিরোধীরাই জোটবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের গঠিত ইন্ডিজোটে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস-বাম-অতিবাম সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন হইতে নজর ঘুরাইতে; রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী শক্তির উত্থান প্রতিহত করিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী তাবৎ রাষ্ট্রবিরোধীদিগের দ্বারা মঞ্চস্থ একটি রাজনৈতিক কুনাট্য ব্যতীত কিছুই নহে। বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করিতে তাহারা ব্যর্থ হইলেও, বঙ্গ রাজনীতিকে তাহারা শিক্ষা-বিবর্জিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে একটি সাজানো লড়াই। রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া তাহারা যে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হইতে চায় তাহা জানিয়া গিয়াছে রাজ্যবাসী। জনগণসম্মুখে তাহাদের স্বরূপ হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য মনীষীদিগের স্মৃতিবিজড়িত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিলম্বে রাহুমুক্তি ঘটাইতে, বঙ্গ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রুখিতে এবং রাজ্যের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবুদ্ধ সমাজের অগ্রণী ভূমিকা আজ অতি আবশ্যক।

সুভাষিতম্

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম ততঃ সুখম্।।

বিদ্যা বিনয় প্রদান করে। বিনয় হতে প্রাপ্ত হয় যোগ্যতা। যোগ্যতার দ্বারা ধন অর্জন করা যায়। ধনের মাধ্যমে ধর্ম লাভ করা যায় এবং ধর্ম হতে সুখপ্রাপ্ত হয়।

রাজ্যের মানুষ চক্রব্যূহেই কি বসবাস করতে থাকবে?

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

হেডলাইনটি মহাভারতে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। মানে যেথা ধর্ম সেথা জয়। মহাভারতের ধর্ম আর আধুনিক রাজনীতির ধর্ম আলাদা। প্রথমটি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরেরটা ক্ষমতা। শাশ্বত সনাতনী ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠী সংঘাত ছেড়ে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করে। বন্দেমাতরমের প্রথম ইংরেজি অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দ 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম'কে— 'দাউ আর্ট নলেজ দাউ আর্ট কনডাক্ট' বলেছিলেন। যা ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত তাই ধর্ম। যতো ধর্মস্ততো জয়ের সঙ্গে একবার লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম যুক্ত হয়। দুর্যোধনকে ভীষ্ম বলেছিলেন 'যতো কৃষ্ণ ততো ধর্ম। যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' অর্থাৎ যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয় অনিবার্য। চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি। এ রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ভোটার দুর্নীতি আর অধর্মের সঙ্গে আপোশ করে চলছে। বাধ্যবাধকতা কবে কাটবে সেটা দেখার। ১৩ মাস বাদে ভোট। ভোট যোদ্ধারা তাই আসরে। মহাভারতে বর্ণিত বা ঋষি বঙ্কিম ও শ্রীঅরবিন্দের উল্লিখিত ধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার কতটা মিল তা বলা মুশকিল।

অধর্ম আর দুর্নীতি করে শাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতা-মন্ত্রী- শিক্ষক-আমলা জেল খেটেছেন। অথচ দলের দুনম্বর নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তের চার্জশিটে অভিযুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত অভিষেক হলো অধর্মের মূর্ত প্রতীক। অধর্মকে উৎখাত করতে ধর্মযুদ্ধের সময়োচিত আহ্বান দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে অস্ত্র, বুদ্ধি আর উপদেশ জোগানোর দায়িত্ব সবার। না হলে পাপের ঘরের চক্রব্যূহ ভেদ করা তাঁর একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। পাপের ঘর বৃহৎ, তাই প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের সূক্ষ্ম ব্যবহার সমীচীন। বিশ্বকবির কথায়, 'যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।' মমতার অপশাসন সেই জীর্ণ লোকাচার যার অবসানে জোরদার ধাক্কার প্রয়োজন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সে চিহ্ন আঁকা হয়। মুছে না গেলেও এটা মানতে হবে যে, ২০২১ আর ২০২৪ ভোটে তার খানিকটা ফিকে হয়েছে।

তবে সে প্লানভাব এতটা খারাপ নয় যে শুভেন্দুবাবুর ধর্ম প্রতিষ্ঠার ডাককে মানুষ অনাদর করতে পারে। মহিষাসুরের কায়দায় মমতা ব্যানার্জি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে পারেন। অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ রাজনৈতিক চাতুরী ব্যবহার করে নিজের অপশাসন থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিছু খেলায় আপাতত জিতেছেন তবে সব খেলায় জিতবেন না। মমতার ছায়া তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্তালিনের ভিতর দেখা যাচ্ছে। দু'জনেই নিজেদের রাজ্যকে নরেন্দ্র মোদী চালিত ভারতের অন্তর্গত দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ভাবেন। তাসের দেশ। তাই ভুয়ো ভোটার থেকে শুরু করে ভাষার আধিপত্যের ভিত্তিহীন লড়াইয়ে শামিল হন। সতীর্থরাই মমতার বড়ো শত্রু। তবে সে খেলা তার হাতের বাইরে। সাগরিকা ঘোষ বা হুমায়ুন কবীরকে তাকে গিলতেই হবে। যেমন গিলতে হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। মহুয়া যাকে টার্গেট করেছিলেন সেই শিল্পপতির চাপে পড়ে মমতা এখন মহুয়ারই ডানা কেটে দিয়েছেন। চলৎশক্তিহীন হয়ে মহুয়া সংসদে মুখ গুঁজে বসে থাকেন।

> **সাগরিকা ঘোষ বা হুমায়ুন কবীরকে তাকে গিলতেই হবে। যেমন গিলতে হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। মহুয়া যাকে টার্গেট করেছিলেন সেই শিল্পপতির চাপে পড়ে মমতা এখন মহুয়ারই ডানা কেটে দিয়েছেন।**

দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেকে 'হিন্দু' বলে তুলে ধরেছেন শুভেন্দুবাবু। বর্তমান ভারতে শুভেন্দুবাবুর এই সাচ্চা ভাবটাই প্রয়োজন। কেউ সাচ্চা মুসলমান হলে শুভেন্দুবাবুরাই-বা কেন নিজেকে সাচ্চা হিন্দু বলবেন না। বিদেশি বামেদের মুসলমান নেতা মহম্মদ সেলিম গোঁসা করে শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে চেয়েছেন। তবে এটা জানেন না যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান শর্ত হলো নিজের ধর্মীয় মতকে সবার সামনে তুলে ধরা, লুকিয়ে রাখা নয়। একসময় বিদেশি বামেরা নিজেদের সাচ্চা কমিউনিস্ট বলত আর পত্রিকার প্রচারে দেওয়াল লিখত 'মুখোশের আড়ালে নয় মুখোমুখি'। তাদের দলীয় বুদ্ধিজীবী (পার্টি ইনটেলেকচুয়াল) অশোক মিত্র তো 'ভদ্রলোক' এর বিরুদ্ধ শব্দ তৈরি করে নিজেকে বলেছিলেন 'কমিউনিস্ট'। মমতার ভিন্ন অঙ্ক। কংগ্রেসের হিডেন অ্যাজেন্ডার মতো লুকিয়ে থাকা। মুখোশের আড়ালে। তাই মমতা হিন্দু হয়েও হিন্দু নন। মুসলমান সেজেও মুসলমান নন। আবার নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করে হাঁসজারু হন। তাই মমতা জানেন না বা জানতে চান না যে ভবিষ্যতে বা ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'-এর কী অর্থ হতে পারে। যেমন চোরা ধর্মের কাহিনি শোনে না, তেমন ঢেঁকিকেও কিল মেরে তোলা যায় না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিঘায় হিন্দুধর্মের অপমান কেন দিদি?

দুধেলগাভীপ্রিয়াসু দিদি,

জানি আপনি দুধেল গাইদের ভালোবাসেন। বেশিই ভালোবাসেন। আর লোকদেখানো ভালোবাসা রয়েছে হিন্দুদের জন্য। শুধু মুসলমান ভোট দিয়ে তো আর ক্ষমতায় আসা যাবে না তাই হিন্দুদের বোকা বানাতে চান আপনি। বিধানসভায় নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন, মঞ্চে উঠে ভুলভাল মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আর সেভাবেই দিঘায় মন্দির বানাচ্ছেন।

হিন্দুদের বিশ্বাসকে মারাত্মক অপমান করা হচ্ছে সেখানে। দেখে এলাম দিঘায় গিয়ে। আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ ধাম তৈরি করছেন সরকারি খরচে। আর সেটা করতে গিয়েই ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুত্বের অপমান করছেন। হিন্দু বিশ্বাসে চারটি পবিত্র ধাম। বদ্রীনাথ, দ্বারকা, রামেশ্বরম ও পুরী। শ্রীক্ষেত্র পুরী আবার জগন্নাথধাম নামেই বেশি পরিচিত। এখন সরকারি খরচে জগন্নাথধাম তৈরি করা হচ্ছে দিঘায়। রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী এমনটা কি আদৌ করতে পারেন? চার ধামের পরে পঞ্চম ধাম বানানোর অধিকার কে দিয়েছে সরকারকে? চার ধামের প্রতিটিতে একজন করে শঙ্করাচার্য থাকেন। এই প্রথা অনেক প্রাচীন। সনাতন ধর্মের এই প্রথা ভেঙে অতীতে কেউ কোথাও পঞ্চম ধাম বানানোর কথা ভাবেননি। আপনি সেটাই করছেন।

নতুন একটা মন্দির পেয়ে নাচানাচি করা হুজুগে হিন্দুরা কি এই অপমানের পরেও চুপ করে থাকবেন? এখন তো মসজিদ বানানোর দাবিও উঠছে। সেটা উঠবেই। তৃণমূলের দুধেল গাইরা ছেড়ে দেবে না। ইতিমধ্যেই ফুরফুরা শরিফের কর্তারা বলেছেন দিঘায় ৩০০ কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানাতে হবে। তা না হলে তৃণমূলকে ভোট দেবে না কোনো মুসলমান। এবার কী করবেন দিদি?

এই রাজ্যে সব কিছুই হয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়। এবার হিন্দুত্বের অপমানও হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়। দিঘায় লেখা হয়েছে 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় জগন্নাথধাম'। আপনি আপনার অনুপ্রেরণায় মসজিদ বানানোর কথা লিখতে পারবেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেব-দেবীরাই প্রেরণা দেন। সেই প্রেরণায় সাধুজনেরা মন্দির স্থাপন করেন। দেবতা সেখানে বিরাজিত হন। কিন্তু কোনো ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় কি দেবতা মন্দিরে আসতে পারেন? কারও অনুপ্রেরণায় কোনো সৃষ্টি ধাম হতে পারে? এই কাজ আপনি অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে করেন না। করতে পারবেনও না। সে সাহস নেই। একজন হিন্দু হিসেবে বলব, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসকেই আঘাত করার সাহস দেখানো উচিত নয়। কিন্তু হিন্দুদের নিয়ে ভাবতে হয় না। উদার হিন্দুরা সব মেনে নেন। তা বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রভু জগন্নাথকেও অনুপ্রেরণা দেবেন?

রমজান মাস ইচ্ছা মতো এগিয়ে আনতে পারবেন? কোনো মুসলমান পরবকে নিয়ে কার্নিভ্যাল করতে পারবেন? আসলে অপমান করার জন্য সনাতন ধর্ম। যা খুশি করে ভোট কেনার চেষ্টা। আর হুজুগে হিন্দুরা সেটা মেনেও নেন।

সম্প্রতি আপনি ফুরফুরা শরিফে গিয়েছিলেন। সেখানে ইফতার যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। আমি টিভিতে দেখলাম আপনার উদ্যোগে নির্মিত মেহমানখানায় ইফতারের আয়োজন হয়েছিল। সেখানেই আপনি বললেন, 'আমি দুর্গাপুজো-কালীপূজা করলে প্রশ্ন ওঠে না তো! তাহলে এখন প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি সব ধর্মের সব অনুষ্ঠানে যাই। আমি ক্রিসমাসে যাই, গুরুদ্বারে যাই, রমজানে যাই, ইফতারেও যাই। বঙ্গের মাটি সম্প্রীতির মাটি।'

বেশ করেন যান। অনেকেই যায়। কিন্তু আপনি যেভাবে মহালয়ার আগে হিন্দুদের পবিত্র দুর্গাপূজা পিতৃপক্ষেই শুরু করে দেন সেটা অন্যদের ক্ষেত্রে পারবেন? রমজান মাস ইচ্ছা মতো এগিয়ে আনতে পারবেন? কোনো মুসলমান পরবকে নিয়ে কার্নিভ্যাল করতে পারবেন? আসলে অপমান করার জন্য সনাতন ধর্ম। যা খুশি করে ভোট কেনার চেষ্টা। আর হুজুগে হিন্দুরা সেটা মেনেও নেন। তবে দিদি, মেনে নেয় বলেই যে এই কাজটা সঠিক তা কিন্তু নয়। দোহাই আপনাকে, দিঘায় জগন্নাথধাম বানানো থেকে বিরত থাকুন। পুরীর মন্দিরের অনুকরণে তৈরি ওই মণ্ডপ প্রদর্শনীর জন্য থাকুক। আর অনুপ্রেরণা দেওয়াটা একটু বন্ধ রাখুন। বঙ্গের হিন্দুরা কিন্তু জাগছে। □

কেরালায় সরকারি মদতে জঙ্গি সংগঠনের নাম নতুন, কাজ পুরাতন

কেরালায় নিষিদ্ধ সংগঠন এখন নতুন রূপে সামনে আসছে। তার মধ্যে কেন্দ্র সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই), ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া, অল ইন্ডিয়া ইমাম কাউন্সিল (এআইআইসি), ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এনসিএইচআরও), রিহ্যাব ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (আরআইএফ), ন্যাশনাল উইমেন ফ্রন্ট, জুনিয়র ফ্রন্ট, এম্পাওয়ার ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই সংগঠনগুলির উপর দেশবিরোধী কার্যকলাপের কারণে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এখন এই সংগঠনগুলি মানবাধিকার সংগঠনের ছদ্মবেশে সামনে এসেছে। নতুন সংগঠনের নাম ন্যাশনাল কনফেডারেশন ফর হিউম্যান ডিগনিটি অ্যান্ড রাইটস (এনসিএইচডিআর), যা কিনা এন সি এইচ আর ও-র নতুন রূপ। এনসিএইচডিআর মানবাধিকার কর্মীর বেশে কাজ করে, যা ইদানীং কোঝিকোডে লঞ্চ করা হয়েছে।

অতিথি কলম

টি সতীশন

নিষিদ্ধ ঘোষণার পর ইসলামি জঙ্গি সংগঠন পিএফআই-এর স্লিপার সেল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু বর্তমানে নতুন রূপে কেরালার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দা সংস্থাও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। যদিও, এখনো পর্যন্ত স্লিপার সেলের মাথা আর তাদের সংগঠনের ব্যাপারে তেমন কার্যকরী তথ্য হাতে আসেনি, কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারা সকলে এক ছাতার তলেই জেলা একক রূপে কাজ করছে। আসলে, এটা নিষিদ্ধ হওয়া এবং গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচতেই এই কৌশল।

সন্দিগ্ধ সংগঠন এনসিএইচআরও-র এক সময়কার সভাপতি বিলায়োদি শিওনকুট্টিকে এখন এনসিএইচডিআর-এর সভাপতি করা হয়েছে। এনসিএইচডিআরও বর্তমানে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, রাজস্থান, গোয়া ও নতুন দিল্লিতে সক্রিয়। এনসিএইচডিআর-এর লঞ্চিং অনুষ্ঠান প্রথমে জমাত-এ-ইসলামির সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যার্থী ভবনে হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের সবরকম প্রস্তুতি হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের চারপাশে বড়ো সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়, কিন্তু নিশ্চিত সময়ের ঠিক আগেই আয়োজকদের মধ্যে একজন ওয়াহিদ শেখ প্রদেশ সভাপতি বিলায়োদী শিওনকুট্টির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বক্তব্য পেশ করে জানায় অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। শিওনকুট্টি জানিয়েছে অনুষ্ঠানটি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় আয়োজিত হবে।

নতুন নাম, পুরাতন কাজ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনুষ্ঠানে জমাত-এ-ইসলামির নেতা ছাড়াও ওয়াহিদ শেখ, সাদিক উলিয়িল, অফজল খাসিমি, প্রো. খাজা খানি (তামিলনাড়ু মুসলিম মুন্নেট্রা কঝকম সম্পাদক), মুহম্মদ মুনির (ইন্ডিয়ান তৌহিদ জমাত, চেন্নাই), ওয়ার্কলা রাজ, রসিক রহিম, শ্বেতা ভট্ট এবং আর রাজাগোপালের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রয়েছে।

অফজল খাসিমি নিষিদ্ধ অল ইন্ডিয়া ইমাম কাউন্সিলের রাজ্য মহাসচিব, যে কিনা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন পিএফআই-এর র‍্যালিতে বিতর্কিত বক্তব্য রাখে। সুন্নি সংগঠনগুলির সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষোভের কারণে সেই কথা প্রত্যাহার করতে হয়। একইভাবে সাদিক উলিয়িল ওয়েলফেয়ার পার্টির কান্নুর জেলার সহ সভাপতি ছিল, যে বর্তমানে জমাত-এ-ইসলামির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কযুক্ত মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য নেতা। ওয়ার্কলা রাজ আবদুল নাসর মদনির নিকট-সহকর্মী। সে এক সময় ইসলামিক সেবক সঙ্ঘ এবং কেরালাস্থিত পিপুলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বরিষ্ঠ পদাধিকারী ছিল। এই দুটি সংগঠনই মদনি শুরু করে। মদনি ১৯৯৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে ৯ বছর জেল খেটেছে। এই ঘটনায় ৬৫ জন মানুষ মারা যায় এবং ২০০ জন আহত হয়। এই বোমা বিস্ফোরণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণীর নির্বাচনী জনসভায় করা হয়। ২০০৮-এর ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মদনিকে ২০১০ সালে গ্রেফতার করা হয়। এই বোমা বিস্ফোরণে ১ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। অপরদিকে, ওয়াহিদ শেখ ২০০৬-এর ১১ জুলাই 'মুম্বাই ট্রেন ধামাকা'র অভিযুক্ত। সিওনকুট্টি এক সময়ের মাওবাদী।

এই নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির নতুনরূপে ফিরে আসা খুবই ভয়ানক। সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা সোশাল মিডিয়ায় উপর আধিপত্য বিস্তার করতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের ডাক দেয়। এই জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা

সংস্থা এদের উপর সবসময় নজর রাখছে। কিন্তু কেরালার গৃহ মন্ত্রালয় চোখ বন্ধ করে বসে আছে। কেরালায় হিন্দু সংগঠনগুলির অনুষ্ঠান বন্ধ করার দাবি তোলে। হিন্দু ঐক্যবাদী এ বিষয়ে কোঝিকোড শহর পুলিশ আয়োগে অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও, ওয়াহিদ শেখের কথা অনুযায়ী এনসিএইচডিআর একটি মুক্ত সংগঠন, তা রাজনৈতিক দল বা জঙ্গি সংগঠন নয়।

স্লিপার সেলের মধ্যে বেশিরভাগ এসডিপিআই কর্মী, যাদের প্রায়শই পার্কে, সমুদ্রতটে, বাসস্ট্যান্ডেই থাকতে দেখা যায়। তারা এই বিষয়ে খুব সতর্ক, যাতে কোনোভাবেই পুলিশ বা গোয়েন্দাদের নজরে না পড়ে যায়। এই কারণে তারা বিরোধ প্রদর্শন আর স্লোগান দেওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র পরিবেশের সুরক্ষা, সমাজসেবা ও মানবাধিকারের বিষয়েই সামনে থাকে। স্লিপার সেল গোষ্ঠী কোনো অন্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেয় না। সব মিলিয়ে নিজেদের সমাজের সামনে 'ভালো' দেখানোর চেষ্টা করে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি অব মার্কসবাদীর হয়ে কাজ করে।

কেরালায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

কেরালায় ক্রমাগত বেড়ে চলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশও একটা বড়ো সমস্যা। জাল নথিপত্র দেখিয়ে রাজ্যে বড়ো সংখ্যায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে, তাই তাদের ধরাটাও সহজ না। তারা সকলেই নির্মীয়মাণ প্রকল্প থেকে শুরু করে অলিগলিতে সবজি প্রভৃতি বিক্রির মতো কাজে যুক্ত। এদের বেশিরভাগই অপরাধপ্রবণ। কেরালায় আসার পরই অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাদক পাচারের কাজে লেগে পড়ে। রাজ্য পুলিশ কিছুদিন আগেই মন্নম, পিরাবোম তালুক, এর্নাকুলমে সৈয়দ মোহম্মদের বাড়ির গোপন ডেরা থেকে ২৭ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে। এরা সকলেই একটা বিল্ডিং ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছে। সকলেই পশ্চিমবঙ্গের পথে অনুপ্রবেশ করে দালাল ধরে কেরালায় চলে আসে। এর্নাকুলম গ্রামীণ জেলা পুলিশ জঙ্গি দমন শাখার সহযোগিতায় এই সব বাংলাদেশির সন্ধান পায় এবং তাদের ধরে বের করতে 'অপারেশন ক্লিন' শুরু করে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত ৩৫ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার করেছে। বস্তুত, অসমে জাতীয় নাগরিকতা পঞ্জীকরণ শুরু হলে সেখান থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা কোচ্চি আসতে শুরু করে। যেহেতু কেরালায় শ্রমিকের কাজ সহজেই পাওয়া যায়, তারা তার লাভ তোলে। এরাই কেরল থেকে কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা চলে যায়। প্রথমে কেরালায় অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করতে হতো, কিন্তু এখন এ ব্যাপারে ঢিলেমির কারণে এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এই অনুপ্রবেশের পিছনে বামপন্থীদের তুষ্টীকরণ নীতি দায়ী। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন শাখা সিটু এতে বড়ো ভূমিকা পালন করছে, কেননা পরবর্তীতে এরাই ভোটব্যাংক হিসেবে কাজে লাগবে।

সমস্যা হলো, এই অনুপ্রবেশকারীরাই স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা ৭৫ হলেও বিনা রেজিস্ট্রিতেও বিয়ে হচ্ছে। গত বছর ১৭-১৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও কেরালা পুলিশ 'অপারেশন প্রঘাত'-এর মাধ্যমে জঙ্গিদের একটা বড়ো চক্রের পর্দা ফাঁস করে। এটিএস ৮ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে কেরালার কাসরগোড থেকে গ্রেপ্তার মোহম্মদ সাদ ওরফে সাদ শেখও ছিল। সে জাল পাসপোর্টে কেরালা এসেছিল এবং বিল্ডিং নির্মাণে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছিল।

কেরালার বামপন্থী সরকার পুরোপুরি মুসলিম তুষ্টীকরণ করে চলেছে। মন্দিরে নমাজ পড়া, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানও করা, এমনকী মাংস রান্না করে মন্দির অপবিত্র করা হচ্ছে। সরকারি অনুষ্ঠানেও নমাজ পড়া হচ্ছে। হিন্দু পরম্পরার উপর এভাবেই রাজ্য সরকার অনবরত আঘাত হেনে চলেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিরুঅনন্তপুরমের শঙ্খমুখম উপকূলে অবস্থিত চট্টানী মঞ্চ আট্টু মণ্ডপমে আমিষ রান্না করা হয়। এসবই কুন্দুবশ্রী নামের সরকারি সংস্থার দ্বারা আয়োজিত খাদ্য উৎসব 'থীরাসমগমম' (বিচ মিট) এর নামে হয়। এই নিয়ে অভিযোগও জানানো হয়। কিন্তু সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আট্টু মণ্ডপম একটি পবিত্র স্থান, যেখানে শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে উৎসবের অংশ রূপে অরট্টু পূজা হয়। হিন্দু নেতৃত্ব মণ্ডপমের পাশে নির্মিত অস্থায়ী শৌচালয়ের উপরও আপত্তি জানিয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে পুলিশ সরিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগে অলপ্পুঝা জেলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্‌ঘাটন ইসলামি রীতিতে করা হয়। ইসলামি প্রার্থনা পাঠ করা হয়। এটি অলপ্পুঝা জেলার কায়মকুলনে ১৭ ফেব্রুয়ারি নগরপালিকা স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্‌ঘাটনকে কেন্দ্র করে হয়। এতে রতিব ও দুয়া মজলিসের আয়োজন করা হয়। এর আয়োজন করে মুসলিম বিচারক চালিস্সেরি থঙ্গল। অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়করাও উপস্থিত হন। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের। যে ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতিনিধিত্ব করে ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগের পার্ষদ। প্রশ্ন উঠছে, সরকারি অনুষ্ঠানে ইসলামি রীতি পালন করা দেশের সংবিধান ও পন্থনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির পরিপন্থী নয়?

বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, পিনারাই বিজয়ন সরকার কি এসব করে কায়মকুলম নগরপালিকাতে শরিয়তি শাসনের ঘোষণা করেছে? যদি না করে থাকে তবে উদ্‌ঘাটনের অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আসলে, এই ধরনের ষড়যন্ত্রে বামপন্থী সমর্থন রয়েছে। এসব করে তারা ভোটব্যাংক সুনিশ্চিত করে। কয়েক মাসের মধ্যেই কেরালায় স্থানীয় নির্বাচন রয়েছে এবং এর পরেই ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন। এই কারণে বামপন্থী তুষ্টীকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে।

মনে রাখা উচিত, গত বছর উত্তর কেরালার এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে নবনির্মিত ভবন উদ্‌ঘাটনে গণপতি হোমম আয়োজন করা হয়, তখন ক্ষমতাসীন এলডিএফ ও বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব চলা ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) মিলিতভাবে গণ্ডগোল বাধায়। সেটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান ছিল, তাতে কেবল ব্যবস্থা সংক্রান্ত সদস্যরাই ছিল। কিন্তু যখন সরকারি অনুষ্ঠানে নমাজের আয়োজন হলো তখন উভয় পক্ষের মুখেই তালা পড়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

বাংলাদেশে সেনা-অভ্যুত্থানের ছক বানচাল নয়াদিল্লির

দীর্ঘদিনের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে গিয়েছিল। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের (ডিজিএফআই) বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সূত্র জানিয়েছে, মার্চ মাসের প্রথম দিক নাগাদ বাংলাদেশে সেনা-অভ্যুত্থানের জোরালো চেষ্টা হয়েছিল। তবে সেদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ্জামানের বিরুদ্ধে ক্যু-র যাবতীয় চেষ্টাকে আপাতত ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারত। কেন এই সেনা-অভ্যুত্থানের চেষ্টা? সূত্রের খবর, বাংলাদেশে কট্টরপন্থীদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও তাদের কাছে মাথা না নোয়ানোর আদর্শে অটল ছিলেন জেনারেল ওয়াকার-উজ্জামান। বরং তিনি একাধিকবার মোল্লাবাদীদের আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সেনাকে যেন আইন-শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য না করা হয়। একইসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সমঝোতার ফাইলেও না ভেবে সই করতে রাজি ছিলেন না। কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ্জামান সমস্ত বাংলাদেশি রাজনৈতিক নেতাকে সতর্ক করে এই বার্তা দেন যে, দেশের এই অস্থির সময়ে নেতারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হবে। নেতারা বিভাজনের রাজনীতি করলে দেশের সার্বভৌমত্ব সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করার ফলে মোল্লাবাদীরা সেই সুযোগ নিচ্ছে।

অন্যদিকে, ভারতীয় কূটনীতিকদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত কয়েকমাসে ক্রমে পাকিস্তানের সঙ্গে গভীর সখ্য তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের। কোনো নিরাপত্তা-ছাড়পত্র ছাড়াই যে কোনো পাকিস্তানি নাগরিককে ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেদেশের অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকার। এর ফলে ভারতের মাটিতে আইএসআই এবং জামাতের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রকট হয়েছে। বন্ধু দেশগুলিকে নিয়ে পাকিস্তানের নৌবহিনী দু'বছর অন্তর করাচিতে একটি মহড়ার আয়োজন করে। 'আমন-২৫' নামে চলতি মার্চের এই মহড়ায় এই প্রথম অংশ নিতে চলেছে বাংলাদেশের নৌবাহিনীও। এই আবহে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও সদা সতর্ক ছিল নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বাংলাদেশি সেনাপ্রধানকে সরানোর পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বেছে নেওয়া হয় বাংলাদেশের সেনার একাধিক কট্টরপন্থী ও পাকপন্থী অফিসারকে।

সেনা-অভ্যুত্থানের মূল দায়িত্ব লেফট্যানেন্ট জেনারেল মহম্মদ ফইজুর রহমানকে দেওয়া হয়। ভারতীয় গোয়েন্দারা সূত্র মারফত খবর পান যে, বাংলাদেশ সেনার বর্তমান প্রধান ওয়াকার উজ্জামানকে পদ থেকে সরানোর জন্যে এই ফইজুর নাকি সেনা সদর দপ্তরের জেনারেলদের (অফিসার কমান্ডিং) বৈঠকও ডেকেছিলেন। জামাতপন্থী ফইজুর নিজের 'শক্তির' বিচার করতে চাইছিলেন। এই আবহে সম্প্রতি ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ওয়াকারের বিরুদ্ধে সেভাবে সমর্থন জোগাড় করতে পারেননি ফইজুর। এই ফইজুর সম্প্রতি ঢাকায় আইএসআই কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে ওয়াকারকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরাতে নাকি ১০ জন জেনারেল ষড়যন্ত্রে শামিল আছেন। পুরো বিষয়টির সম্বন্ধে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানকে এনিয়ে সতর্ক করে নয়াদিল্লি। বিষয়টি আমেরিকা ও ইউরোপের একাধিক দেশকেও জানানো হয়। নয়াদিল্লির কথা শুনে আন্তর্জাতিক মহল বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসকে এক বার্তায় সতর্ক করে বলে যে, আপনার সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্যু হতে চলেছে। আপনি সেটা ঠেকান। ভারতীয় গোয়েন্দারা ঢাকা থেকেই ওয়াকার-উজ্জামানের সঙ্গে মার্কিন সেনার অফিসারদের কথা বলিয়ে দেন। জানা যায়, বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের কমিউনিকেশন ডিভাইস ট্যাপ করা শুরু হয়ে গেছে। ভারতের পরামর্শেই গত ১৩ মার্চ জেনারেল ওয়াকার-উজ্জামান সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে যান। সরকারি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় যে, তিনি সেখানে মোতায়েন বাংলাদেশের শান্তিসেনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন। আসলে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি মার্কিন সেনার শীর্ষ আধিকারিকদের কথা হয়। মায়ানমারের পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে বেরিয়ে না যায়, সে সমস্ত তিনি দেখবেন বলে মার্কিন সেনাকে আশ্বস্ত করেন জেনারেল ওয়াকার-উজ্জামান। এরপর, সেনাপ্রধানের সুরক্ষায় ইউনুস সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ে। তবে, বাংলাদেশের পাকপন্থী সেনাআধিকারিকরা সবটাই আন্দাজ করে ফেলেন। তারা ঠিক করেন, ৬ মার্চ ঢাকায় ফিরলেই ওয়াকার- উজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা হবে।

তবে, এবারও ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে সূত্র মারফত আগাম এই খবর ফাঁস হয়। তাঁদের পরামর্শে ঢাকার বদলে তেজগাঁও এয়ারবেসে নামেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। সেখানে তাঁকে রিসিভ করেন তাঁর অনুগত সেনা-আধিকারিকরা। ওই আধিকারিকদের নির্দেশে যে কোনো পদক্ষেপের জন্য সেইসময় সেনাকর্মীদের তৈরি রাখা হয়। এরপর বিশাল নিরাপত্তা-বাহিনী নিয়ে ঢাকায় আসেন ওয়াকার- উজ্জামান। অনুগত আধিকারিকরা তাঁর বাড়ি, অফিস ঘিরে রাখেন। একইসঙ্গে, আমেরিকা থেকে ইউনুসের কাছে চরমবার্তা আসে। সবমিলিয়ে, ক্যু-য়ের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

যাইহোক, বিপদের ফাঁড়া আপাতত শুধু বাংলাদেশি সেনাপ্রধানের ওপর দিয়ে নয়, পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর দিয়েই কেটে গেছে। আগামীদিনে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকে আমাদের সতর্ক নজর থাকবে। □

ছাত্র আন্দোলনের নামে বামেদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়

আনন্দ মোহন দাস

সম্প্রতি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীকে ঘিরে জোরালো হয়েছে দোষারোপ ও পালটা দোষারোপের পালা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই বাম ও অতি বামপন্থীদের আখড়া। শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রেসিডেন্সি, দিল্লির জেএনইউ ও দেশবিরোধী বামপন্থার আঁতুড়ঘর। এদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধিতা, দেশকে অশান্ত করে তোলা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক যাদবপুরের আন্দোলনেও। রাষ্ট্রবাদী শক্তির উত্থান রুখতে, বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন থেকে নজর ঘোরাতে এখানেও উঠেছে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্বাচনের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদের আওয়াজ উঠেছে। এখানে স্লোগান উঠেছে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি'। এরা কাশ্মীর ও মণিপুরকে আজাদ করার দাবি করে। কাশ্মীর ও মণিপুরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এরাই 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনসাল্লাহ ইনসাল্লাহ' রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়ে থাকে। এদের টিকি বাঁধা রয়েছে চীন, পোল্যান্ড, কিউবা, ব্রিটেন ও আমেরিকার ভারতবিরোধী শক্তির সঙ্গে। এরা বাবার নাম ভুলতে পারে কিন্তু ভুলতে পারে না ভিয়েতনাম। এরা নিজেদের চেগুয়েভারা, মার্কস, লেনিন ও স্তালিনের উত্তরসূরি ভাবে।

বাম ও অতিবাম আন্দোলনের পিছনে রসদ জোগানোর জন্য বিদেশি অর্থের জোগান রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে জর্জ সোরস ও ইউএসএড সংস্থারও আর্থিক মদত থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরা বাক্‌স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদের আওয়াজ তোলে। এরা দেশকে টুকরো করার স্বপ্ন দেখে। এরা হিন্দু সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায়। এরাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের 'ওঁ' নামাঙ্কিত ব্যানার পুড়িয়ে উল্লাস করে। এরাই ক্যাম্পাসে গোমাংস ভক্ষণ করে। ড্রাগ সেবন ও মদিরা পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে অপসংস্কৃতির ছত্রছায়ায় পড়াশোনার নামে অতি বিপ্লবী সাজে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বামপন্থার বিষ ছড়িয়ে মগজধোলাই করে রঙিন স্বপ্ন দেখায়। সরকারি পয়সায় দেশবিরোধী কাজের পসার বসিয়ে ছাত্র আন্দোলন করে। এদের মুখ ও মুখোশ আলাদা। এরা গাজা, প্যালেস্টাইনের মানুষের সমর্থনে আন্দোলন করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের উপর অমানবিক অত্যাচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না। এই হলো এদের চরিত্র ও দ্বিচারিতা।

শাসকদলের ভোট ব্যাংক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা বিদেশি বেআইনি ভোটাররা রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবে যা গণতন্ত্র ও দেশের পক্ষে বিপদজ্জনক।

প্রকৃতপক্ষে বাম অতিবামরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দু বিরোধী। শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একদা দোসর বামফ্রন্ট সরকার এদের সাহায্য নিয়ে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বনাশ করে ৩৪ বছর রাজত্ব করে গেছে। এদের মদতে এই সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং ছাত্র রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থার আঁতুড়ঘর গড়ে উঠেছে। এরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বামপন্থা ও দেশবিরোধী শক্তির স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশবিরোধী আওয়াজ উঠলেও বামেরা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। একইরকমভাবে বর্তমান রাজ্য সরকারও বাম, অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলি রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিলে বা শিক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হলেও কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাবোধ করে। কারণ এরাই নির্বাচনে 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগান তুলে শাসক তৃণমূলের সুবিধা করে। এদের কাছে 'নেশান ফার্স্ট' নয়, ভোট বড়ো বালাই। সেজন্য শাসকদলকে সমর্থন দেয়। সেজন্য বর্তমান শাসকেরও কড়া ব্যবস্থা নিতে অনীহা দেখা যায়। বর্তমান শাসকদলও বামেদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করেছে।

তাই রাজ্যে জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় না এলে এর পরিবর্তন ঘটবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর বন্ধ করতে শক্তিশালী সরকারের সদিচ্ছা চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনে বাম, অতি বামদের পীঠস্থান জেএনইউ এখন

ফঃ ২

ঠাণ্ডা হয়েছে। অতি বিপ্লবীদের আধিপত্য চলে গেছে। তাই ছাত্র সংগঠনের নামে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন এখন অস্তমিত। কারণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন।

বলা বাহুল্য আগামী বছর ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় শাসক তৃণমূল ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। তাই এখন থেকেই দল কৌশলগতভাবে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এরা ভোটার তালিকা নিয়ে নানারকম ন্যারোটিভ তৈরি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। বিভিন্ন রাজ্যে একই এপিক নাম্বারে ভোটার থাকার অভিযোগ তুলে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে হইচই ফেলেছে। যদিও নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন, একই এপিক নাম্বার হলেও তারা দুই জায়গায় ভোট দিতে পারেন না। কারণ বুথ নাম্বার, নাম, বাবার নাম, ঠিকানা আলাদা রয়েছে এবং কেবলমাত্র নিজেদের বুথেই তারা ভোটদান করতে পারেন। সুতরাং দুই জায়গায় ভোট দেওয়ার অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। যদিও আশংকা দূর করতে আগামী তিন মাসের মধ্যে ইউনিক এপিক নাম্বারের ব্যবস্থা করবে বলে নির্বাচন কমিশন দলগুলিকে আশ্বস্ত করেছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্টিকরণ দেওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংসদে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ আলোচনার অযৌক্তিক দাবি করেছে। স্পিকার যথার্থ বলেছেন ভোটার তালিকা তৈরির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।

সুতরাং সংসদে আলোচনার চেয়ে বরং রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন কমিশনে বিষয় রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই দলগুলি ন্যারোটিভ বজায় রাখতে চায় যে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করে এদের হারিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আলাদা। এদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আস্থা নেই। প্রথমে বিরোধী দলগুলি ইভিএম নিয়ে অপপ্রচার করেছে, এখন আবার ভোটার তালিকা নিয়ে বিভিন্ন ন্যারোটিভ তৈরি করে জনগণকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনের বদনাম করে এরা রাজনীতি করছে। অথচ জানা গেছে বহু বছর আগে ইউপিএ সরকারের আমলে ম্যানুয়ালি ভোটার কার্ড তৈরির সময় একই এপিক নাম্বারে ভোটার আই কার্ড তৈরি হয়েছে। সুতরাং বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের সারবত্তা নেই। বস্তুতপক্ষে এপিক নাম্বারের মাধ্যমে ভোট দান হয় না। সেজন্য নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ করেছে। তাছাড়া রাজ্যে বিগত ১৪ বছর তৃণমূলের সরকার রয়েছে। বুথ লেভেল অফিসার, বিডিয়ো, এসডিয়ো ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার (RO), যাদের মাধ্যমে ভোটার তালিকা ও ভোটার কার্ড তৈরি হয়, তারা সকলেই নির্বাচনী কাজে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অধীনে কাজ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে বিজেপির পক্ষে কারচুপি করার সুযোগ নেই। ভোটার তালিকায় কারচুপি থাকলেও বিজেপির বিরুদ্ধে কারচুপি করার অভিযোগ আদৌ ধোপে টেকে না। বরং প্রশাসনিক সহযোগিতায় শাসকদল ভোটার তালিকায় নানা ধরনের কারচুপি করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে।

শাসকদলই ভোট বৈতরণী পার হতে ভোটার তালিকায় কারচুপি, ভুয়ো ভোটার নথিভুক্তকরণ, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম নথিভুক্ত করে বেআইনি কাজ করেন। শাসকদলের বদান্যতায় ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড পাইয়ে দিয়ে নিজেদের পক্ষে ভোট ব্যাংক তৈরি করেন। প্রবাদ রয়েছে, 'চোরের মায়ের বড়ো গলা।' এই অভিযোগ নিয়ে হইচই করার নেপথ্যে নাকি অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। ইতিমধ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, বহিরাগত ভোটারের নামে বেশ কিছু কেন্দ্রে হিন্দিভাষী ও অবাঙ্গালি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে। তাই অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে শাসকদল এই ধরনের অভিযোগ করছে বলে অনেকে মনে করেন। দীর্ঘদিনের পরম্পরা রয়েছে ভোটার তালিকা নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে নির্বাচন কমিশনের কাছে তথ্যসহ অভিযোগ দায়ের করা। কিন্তু তার পরিবর্তে অকারণ রাজনীতি করে সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনের নিরন্তর সমালোচনা করা সুস্থ গণতন্ত্রের পরিচায়ক নয়।

অপরদিকে গত ১১ মার্চ রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্যে দলের ইনচার্জ অমিত মালব্য-সহ কয়েকজন রাজ্যের সাংসদ দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে ভোটার তালিকা নিয়ে তথ্য-সহ ডেপুটেশন দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সুকান্ত মজুমদার নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন যে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ১৩,০৩,০৬৫ জন ডুপ্লিকেট ভোটার রয়েছেন, যাদের নাম, বাবার নাম ও বয়স একই রয়েছে। তিনি কমিশনকে এর তালিকা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এদের নাম বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং এই ১৩ লক্ষের বেশি ডুপ্লিকেট ভোটার বানানোর জন্য দায়ী কে? এর জন্য কী বিজেপি দায়ী? দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এত সংখ্যক ডুপ্লিকেট ভোটার নির্বাচনের ফলাফলে নিশ্চিতভাবে প্রভাব ফেলবে। তাই অবিলম্বে এদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রায় ৭০০০-এর বেশি ভোটার একই এপিক নাম্বারে থাকায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এছাড়াও রাজ্যের ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করে ভোটার তালিকা সংশোধন করার জন্য কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের নির্বাচনে হিংসা ও রক্তক্ষয় বন্ধ করতে কমিশনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন। নইলে রাজ্যের আগামী নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য রাজ্যের ভোটার তালিকার পূর্ণাঙ্গ অডিট হওয়া দরকার এবং এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। শাসকদলের ভোট ব্যাংক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা বিদেশি বেআইনি ভোটাররা রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবে যা গণতন্ত্র ও দেশের পক্ষে বিপদজ্জনক। তাই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বাসা ভাঙতে পশ্চিমবঙ্গে পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রয়োজন রয়েছে।

যাদবপুরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বামেরা
তিয়েনআনমেন স্কোয়ার গণহত্যায় চুপ কেন?

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা'র বার্ষিক সভাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার। ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় পড়ুয়াদের। প্রথমে ধস্তাধস্তি, তারপর হাতাহাতি। গাড়ির কাঁচ ভাঙল, রক্ত ঝরল। পড়ুয়ার উপর গাড়ি চালানোর অভিযোগে বিক্ষোভ করছে বাম দলগুলো। আন্দোলনের নামে অভব্যতা ও গাজোয়ারির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল। ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা ব্যর্থতা দেখছে কলকাতা হাইকোর্ট। কোর্টের মন্তব্য, এমন চললে ভবিষ্যতে আরও খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। গত ৬ মার্চ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেছেন, 'এত বড়ো ঘটনা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের শিক্ষা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।... কীভাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এত লোকের জমায়েত হলো? গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। সেটা তো হতে দেওয়া যায় না। ওই ভিড় সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দারা যদি জানতে না পারে, আরও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ভবিষ্যতে।'

এতদিনে রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে মৃতপ্রায় বামদলগুলোকে চাঙ্গা করার জন্য এটা বাম-তৃণমূলের সাজানো নাটক। ওই আহত ছাত্রটি গাড়ির পিছনে ছিল না সামনে ছিল সেটাই যথেষ্ট সন্দেহের। কিন্তু তৃণমূলের এটা করে লাভ কী? বিগত এক বছরের অনেক ঘটনায় ওদের হিন্দু ভোট ব্যাংকে ধস নেমেছে বলে ওদের নেতাদেরই সন্দেহ এবং মুসলমান নেতারাও বিভ্রান্ত। সন্দেশখালি, আরজি কর, সরস্বতী পূজা সবেতে শাসক দলের নঞর্থক ভূমিকায় সাধারণ ভোটারদের মনে অবিশ্বাস জন্মেছে। তাই ওদের দীঘায় মন্দির নির্মাণে এত তাড়াহুড়ো, নেত্রীর ঘোষণা তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা। তাই সিপিএমকে চাগিয়ে তুলে কিছু ভোট যদি কাটানো যায় তাতে বিজেপির জয়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়। আর বামদলগুলি জানে নিজেরা জিতুক না জিতুক ওরা পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে জিততে দেবে না। রাষ্ট্রবাদী দল জিতলে ওদের বিদেশি প্রভুরা চটে যাবেন। আর তাই ওরা নিজ আগ্রহে অভয়া বিচার আন্দোলনে আগ বাড়িয়ে ঢুকে জাতীয়তাবাদীদের তাড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে চরম বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচাল। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে ওদের ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা বলে দিচ্ছিল যে এই আন্দোলনের গোড়ায় জল ঢালতেই ওদের এত সব আয়োজন। ওদের একজন তো অতিবাম দলের সদস্য। আর যে অতিবামরা যাদবপুর দখল করে বসে আছে তারা উগ্র ইসলামের ছদ্মবেশধারী গোষ্ঠী। খালিস্তানপন্থীরাও তাই। না হলে কেউ বলে কাশ্মীরের স্বাধীনতা চাই, ভারত তেরে টুকরো হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ! কম বামেদের ছদ্মবেশ আরও বিভ্রান্তিকর। তারা সভায় এখন হিন্দু মনীষীদের ছবি টাঙাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, ছত্রিশ বছর আগে চীনের রাজধানীতে যে হাজার হাজার ছাত্রকে নৃশংস গণহত্যা করা হলো আজ পর্যন্ত বাম নেতাদের মুখে এই বিষয়ে কুলুপ আঁটা কেন?

এই ঘটনা থিতিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে চীনের রাজধানীতে যে হাজার হাজার ছাত্রকে নৃশংস গণহত্যা করা হলো ঘটনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত বাম নেতাদের মুখে এই বিষয়ে কুলুপ আঁটা কেন? তাঁদের যদি মনে না থাকে আর যারা তখন জন্মাননি তাদের জন্য একটু ইতিহাসটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী দেং জিয়াওপিঙের অর্থনৈতিক সংস্কার ও সেই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে এক দশকব্যাপী বর্ণময় সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান সূচনা হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালের ৪ জুন তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে বিক্ষোভকে চীন সরকার হিংসাত্মকভাবে দমন করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীনা সম্পর্ক বেশ শীতল হয়ে ওঠে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এই দমনের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিবৃতি জারি করে চীনা সরকারকে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের হয়রানি করা এবং নিহত, আটক বা নিখোঁজদের সম্পূর্ণ জবাবদিহি করার আহ্বান জানায়।

১৯৮৯ সালে ১৫ এপ্রিল চীনা ছাত্ররা বেজিঙে তিয়ানানমেন স্কোয়ারে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। সেখানে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে অনেক ছাত্রবিক্ষোভ ও জন-আন্দোলন হয়েছে। জনপ্রিয় সংস্কারপন্থী

চীনা নেতা হু ইয়াওবাঙের মৃত্যু উপলক্ষ্যে এই বিক্ষোভ দুর্নীতি ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে ওঠে। মাওয়ের মৃত্যু-পরবর্তীকালে চীনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

বিক্ষোভ কীভাবে চালিত হবে তা নিয়ে চীনা নেতৃত্বের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছলে কিছু নেতা বিক্ষোভকে কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করলেন। তারা ২৬ এপ্রিল সরকার পরিচালিত পিপলস ডেইলি পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বিক্ষোভকারীদের 'প্রতিবিপ্লবী' বলে সমালোচনা করলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল রাজনৈতিক সংস্কার। তাই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য দলীয় নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন, সেই কারণে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াং ৪ মে বিক্ষোভকারীদের উদ্বেগ শোনা ও মান্যতা দেওয়ার জন্য বিক্ষোভস্থল পরিদর্শন করেন।

১৫ মে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মিখাইল গর্বাচেভের আসন্ন রাষ্ট্রীয় সফরের প্রাক্কালে বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। কিছু বিক্ষোভকারী সরকারের উপর চাপ বাড়াতে অনশন শুরু করে। সফরের বিষয় জানতে ও জানাতে বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। কিছু বিক্ষোভকারী সরকারের উপর চাপ বাড়াতে অনশন শুরু করে। সফরের বিষয় জানতে ও জানাতে আসা বিদেশি মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে এই বিক্ষোভ। আন্তর্জাতিক বিশেষত পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যম বিক্ষোভকারী দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়। স্কোয়ারে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, চীনা সমাজের এক বৃহত্তর অংশ, তার মধ্যে শ্রমিক থেকে শুরু করে বেজিং-সহ বাইরের সাধারণ নাগরিক। জানা যায় সংখ্যাটা দশ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ১৮ মে গর্বাচেভের প্রস্থান পর্যন্ত তাঁর সফর নিয়ে চীনা দলীয় নেতারা ব্যস্ত থাকলেও। ১৯ মে ঝাও অনশন বন্ধের জন্য আবেগময় আবেদন জানিয়ে আরও একবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ২০ মে চীনা দলীয় ও সরকারি নেতৃত্ব বেজিঙে সামরিক আইন জারি করে। বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ৩ ও ৪ জুন রাতে, পিপলস্ লিবারেশন আর্মি ট্যাঙ্ক নিয়ে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে আক্রমণ চালায়। বিক্ষোভ দমন করা হয়, ভয়াবহ মানবিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। নিহতের সংখ্যার অনুমান ভিন্ন ভিন্ন। চীনা সরকার দাবি করেছিল আহতের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং ৩৬ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সহ ২০০ জনেরও বেশি মানুষ সেই রাতে নিহত হয়েছে। তবে পশ্চিমী সংবাদ সূত্রগুলো সরকারি চীনা প্রতিবেদনের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং নিহতের সংখ্যা শত শত এমনকী হাজার হাজার বলে উল্লেখ করে। অন্যান্য চীনা শহরেও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছিল; শীঘ্রই সেসব দমন করা হয়েছিল, তাদের নেতাদের কারাবন্দি করা হয়েছিল।

পরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে ঘটা এই নৃশংসতা ঘটনার নিন্দা জানান। চীনকে সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম বিক্রয় আটকে দেন এবং চীনা আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের মতবিনিময় স্থগিত করেন। মার্কিন কংগ্রেসের অনেক সদস্য, আমেরিকান জনগণ এবং আন্তর্জাতিক নেতারা বৃহত্তর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে কিছু রূপায়িত হয়েছিল।

মার্কিন নেতারা প্রতিশ্রুতির প্রতীকী নিদর্শন হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত চীনা নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতি বুশের বাকি মেয়াদ এবং রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের মেয়াদেও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ করে চীনকে মোস্ট-ফেভার্ড-নেশন ট্রেডিং স্ট্যাটাস প্রদান নিয়ে বিতর্ক ছিল।

তৎকালীন ব্রিটিশ অবিকৃত হংকং থেকে পরিচালিত অপারেশন ইয়েলোবার্ডের অধীনে চাই লিং এবং উয়ের কাইক্সির মতো কিছু ছাত্রনেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য (ইউকে), ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কয়েকদিন ধরে অন্যান্য শহরেও ছোটো ছোটো প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। ২০২৪-এর ৪ জুন তিয়েনআনমেনের ছাত্রনেতা ঝো ফেংসুও, বর্তমানে চীনের মানবাধিকার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে 'আমরা তিয়েনআনমেনকে স্মরণ করি কারণ এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটা ভিন্ন চীন কী হতে পারত, কারণ চীনা জনগণ তাদের প্রতিবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে'। □

বিশেষ সূচনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একশত বছরে স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে যথাক্রমে আগামী ১২, ১৩ ও ২০ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। প্রচার প্রতিনিধিদের নিজের নিজের প্রান্তের নির্দিষ্ট বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

দক্ষিণবঙ্গের বৈঠক ১২ এপ্রিল, ২০২৫, শনিবার, সকাল ১০টা
স্থান : আস্থা চিলড্রেন্স অডিটোরিয়াম
অরবিন্দ সরণি, হাতিবাগান, কলকাতা-৬

মধ্যবঙ্গের বৈঠক ১৩ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা
স্থান : ছাই রোড, ভারতমাতা মন্দির
সঙ্ঘ কার্যালয়, ধাধকা নর্থ পুলিশ স্টেশন, আসানসোল

উত্তরবঙ্গের বৈঠক ২০ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা
স্থান : মাধব ভবন, ৩৯, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোড,
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

যাদবপুর--যেন একখণ্ড পাকিস্তান

যাদবপুরের খাঁজে খাঁজে যে আরবান নকশালদের ডেরা তাকে ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ করতে হলে দরকার মাওবাদীদের 'বাপ' সেনাবাহিনীকে। দরকারে সরকার ছত্তিশগড়ের বস্তারের মতো এই যাদবপুরেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করুক।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কিছুদিন যাবৎ যাদবপুরে হুলুস্থুলু। অবশ্য মাঝে মাঝেই হয়, তবে এবার গণ্ডগোলে শিক্ষা মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে পড়ায় আলোচনাটা একটু বেশি। সেই আবহেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে 'আজাদ কাশ্মীর'-এর পোস্টার' পড়েছে। যাদবপুরে বেয়াদবদের কাণ্ডকারখানা এবারই নতুন নয়। ৭০-এর দশক থেকে মাওয়িস্টরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উগ্রবাদের মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে। যাদবপুর যেন পশ্চিমবঙ্গের কোনো অংশ নয়, এক ভিন্ন গ্রহ। এখানে পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা কোনো কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই।

৫৫ বছর আগে এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশালিরা খুন করেছিল তৎকালীন উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে। দিনটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০। অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন ক্যাম্পাসে রেজিস্ট্রারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে সন্ধ্যায় একা একা বাড়ি ফিরছিলেন। পরের দিনই তার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগদানের কথা ছিল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পেরিয়ে কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় হঠাৎই পাঁচজন ছাত্র লোহার রড আর ছুরি নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথায় পড়তে থাকে রডের বাড়ি, সঙ্গে এলোপাথাড়ি ছুরির আঘাত। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে পড়ে থাকেন তিনি। কাজ শেষে ঝিল এবং ফ্যাকাল্টিক্লাব গেস্ট হাউসের মাঝের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কাছাকাছি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলাধুলা করছিল কিছু ছাত্র, দারোয়ানের চিৎকারে তারা এসে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু তার আগেই সব শেষ। পরের ৩৫ বছর তো বামফ্রন্টের শাসন। সে সময় যাদবপুর পুরোপুরি নকশালিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে। ২০১১-য় তৃণমূল সরকারে এলেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শাসক দল ঘাঁটাতে চায়নি তাদের। এই সেদিন ২০১৬ সালের মে মাসে 'মুক্ত চিন্তার স্বর্গ' বলে প্রচারিত যাদবপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ করেছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী।

সেখানে চললো নকশালি হানা। শেষে তা সংঘর্ষে রূপান্তরিত হলো। আবার ২০১৮-এ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে এই যাদবপুরের নকশালিরাই চুলের মুঠি ধরে পিটিয়েছিল। ওই বছরেই ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আচার্য রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে নকশালি ছাত্ররা ৫০ মিনিট ধরে শুধু অবরোধ করেই রাখেনি, চরম হেনস্থা করেছিল। আজ এরাই দেওয়ালে দেওয়ালে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান লিখেছে। এগুলি কি ছাত্র আন্দোলন? নাকি বামপন্থী গণ-আন্দোলনের উদাহরণ? কোনোটিই নয়। ২০১৬ সালে দিল্লির জেএনইউ-র সঙ্গে সঙ্গে এই যাদবপুরের ভেতর থেকে স্লোগান উঠেছিল 'আফজল হাম সরমিন্দা হ্যায় তেরা কাতিল জিন্দা হ্যায়'। ভারতীয় সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলার মাস্টারমাইন্ড আফজল গুরুকে ফাঁসির আদেশ কে দিয়েছিল? দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদের দৃষ্টিতে সুপ্রিম কোর্ট হলো 'কাতিল' অর্থাৎ খুনি। এই দেশদ্রোহী স্লোগান যাদের তারা ছাত্র নাকি পাকিস্তানি উগ্রপন্থী? আজ আবার সেই যাদবপুরে আজাদ কাশ্মীরের পোস্টার পড়েছে। তোমরা সত্যিকারের আজাদি চাও? তবে শুধু তোমরা নও, তোমাদের মত আমরাও আজাদি চাই। তবে কাশ্মীরের আজাদি নয়, আমরা চাই নকশালি যাদবপুরের আজাদি। মাওয়িস্ট মুক্ত যাদবপুর। তার জন্য দরকারে চাই স্টেনগানধারী সেনা। তারাই এই বিষাক্তদের জন্মের মতো আজাদি দিয়ে দেবে। বিষমুক্ত হবে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। আর তার সঙ্গে পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য যাদবপুর ক্যাম্পাসে একটা আর্মি ক্যাম্প চাই। যাতে এই জেহাদি আজাদি চাইলেই সেনারা সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের জন্মের মতো আজাদি দিয়ে দিতে পারে। বাদবাকি ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনাটা করতে পারবে। এই নকশালরা অনেকটা গ্যাংগ্রিন রোগের মতো। পচা ঘা পুষে রাখলেই অল্প দিনে সারা শরীরে পচন ধরে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গের ভাবী প্রজন্মকে বাঁচাতে গেলে এই পচা অঙ্গ কেটে বাদ দিতেই হবে। মুখে শুধু প্রতিবাদ করলে হবে না, প্রয়োজনে ওদের গুরু মাও সে তুং-এর 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এই বাণীর সফল প্রয়োগও করতে হবে। ওরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই উত্তর দিতে হবে।

আশ্বিন কার্তিক মাসে গ্রামাঞ্চলে বাদলা পোকার উপদ্রব হয়। মাটির দেওয়াল বা টিবির ভেতর থেকে এই পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে উড়তে থাকে, জনজীবন ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। গ্রামের মানুষ এদের থেকে বাঁচতে তখন গর্তের মুখে বিষ জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করে। তাতে দু'চারটি মারা পড়ে বটে, কিন্তু দু-এক মিনিট পরে একই হাল, আবার এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরোতে শুরু করে। আসলে এদের বাসা গর্তের মুখে নয়, মাটির অনেক গভীরে। কখনো কখনো ৫/১০ ফুট নীচে। তাই গর্তের মুখে যতই বিষ ঢালো, এরা শেষ হয় না। ২০১৬-তে ভারত সরকার দিল্লির জেএনইউ-তে এরকমই একটি বাদলা পোকার বাসাকে সমূলে ধ্বংস করেছে। আজ আর সেখানে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি'র স্লোগান শোনা যায় না। এখন যাদবপুরেও সেই ওষুধ প্রয়োগের সময় এসে গেছে।

বিগত ৬০/৭০ বছর ধরে মাওবাদের নামে সারাদেশে যে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার পেছনে তিনটি শক্তি কাজ করে চলেছে। এক, যারা অস্ত্র হাতে জঙ্গল অধ্যুষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে। দুই, সেই শহুরে শিক্ষিত নকশালরা যারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে নকশালবাদী তৈরির কারখানা খুলে বসে রয়েছে। আর তিন, সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি বামদলগুলি, যারা সমাজের মধ্যে মিশে থেকে গণতন্ত্রকে ঢাল করে এদের প্রতিনিয়ত নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক সমর্থন দিয়ে চলেছে। এরা কেউ আলাদা নয়, এরা সকলে মিলে একটা টিম। এদের নাম আলাদা, কর্মক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক— ভারতবর্ষকে ধ্বংস করা।

আমরা ছোটোবেলায় দুই রাক্ষসীর গল্প পড়েছিলাম। এক ছিল তাড়কা রাক্ষসী, যার ভয়ানক রূপ দেখে সহজেই চেনা যেত। সে ছিল প্রকাশ্য শত্রু, তাই তাকে বধ করতে ভগবান শ্রীরামের অসুবিধা হয়নি। আর এক ছিল পুতনা রাক্ষসী। যে মায়ের রূপ ধরে বিষ মাখানো স্তন্য পান করিয়ে শিশুকৃষ্ণকে মারতে এসেছিল। সে ছিল ছদ্মবেশী শত্রু। তাই কেউ তাকে চিনতে পারেনি। যাদবপুরের আরবান নকশালরা ঠিক পুতনা রাক্ষসীর মতো। এদের কেউ সেজে আছে ছাত্র, কেউ সেজে আছে অধ্যাপক, কেউ সেজে আছে নেতা, আবার কেউ বা সাধারণ সমর্থক। এরা সকলে মিশে আছে আমাদের সমাজে। এই টুকরো টুকরো গ্যাং চায় দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে। নিষ্ঠুর অত্যাচারী লেনিন, স্তালিন মাও সে তুঙের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ। পাকিস্তানের লক্ষ্য, আর এদের লক্ষ্যে কোনো প্রভেদ নেই। দু'জনেরই টার্গেট ভারতকে শেষ করা।

সেজন্যই এদের স্লোগান— কাশ্মীরের আজাদি, মণিপুরের আজাদি, কেরালার আজাদি, বঙ্গের আজাদি। আর সেই স্লোগানে ইসলামের ছোঁয়া— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাল্লা ইনশাল্লা'। এ এক কমিউনিস্ট-ইসলামিক নেক্সাস। সেজন্য দেশের কোথাও মাওবাদী হামলা হলে, নিরাপরাধের প্রাণ গেলে এরা কেউ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না, সকলেই নির্বাক থাকে। বিপরীতে এদের বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার হলে তাকে তখন এরা 'বাক স্বাধীনতা'র উপর আক্রমণ, 'স্বাধীনতার লড়াই' প্রভৃতি বলে এদের আড়াল করে। দরকারে এদের স্বপক্ষে পথে নামে। এই নকশালবাদের শোরুম হলো বামপন্থী দলগুলি, প্রোডাকশন ইউনিট হলো যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর এদের কাঁচামাল হলো আমার আপনার ঘরের সরলমতি ছেলে-মেয়েগুলি, যাদের ব্রেন ওয়াশ করে এরা আগামী দিনে দেশের বিরুদ্ধে লড়াতে চায়।

বিজেপির এক প্রবীণ নেতা আক্ষেপ করে বলছিলেন— প্যারিসের নিষিদ্ধ পল্লীর এক নিয়মিত অতিথি দুরারোগ্য যৌন রোগ সিফিলিস বাঁধিয়ে বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তাতেই তিনি মারা গেলেন। জানেন কে ইনি? ইনি আর কেউ নয়, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। যার মূর্তি তার নিজের দেশ রাশিয়া উপড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু রাশিয়া থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এই পশ্চিমবঙ্গের কিছু নির্বোধ বাঙ্গালি হিন্দু এখনো তার মরা আঁকড়ে বসে রয়েছে।

মাথায় উকুন হলে বিষ মাখতে হয়। বেছে পরিষ্কার করা যায় না। যাদবপুরের খাঁজে খাঁজে যে আরবান নকশালদের ডেরা তাকে ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ করতে হলে দরকার মাওবাদীদের 'বাপ' সেনাবাহিনীকে। দরকারে সরকার ছত্তিশগড়ের বস্তারের মতো এই যাদবপুরেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করুক। রোগ এক, তাই ওষুধও এক হওয়া চাই। □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় সেকাল ও কলুষিত একাল

সুস্মিতা সেন

১৯০৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টার ফলে যে অভূতপূর্ব জনরোষ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল এই উপলব্ধি যে জাতীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষাব্যবস্থা জাতির পুনরুত্থানের জন্য অপরিহার্য। ফলস্বরূপ, তৎকালীন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে, সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন বঙ্গে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২০ সালে এটিকে 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বেঙ্গল' নামে নামকরণ করা হয়।

১৯০৫ সালে সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এক সভায় ঘোষণা করেন যে তিনি বাংলায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দেবেন। বিপিন চন্দ্র পাল ঘোষণা করেন যে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেবেন। স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত সরকারি স্কুল ও কলেজ থেকে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের বিকল্প শিক্ষা প্রদান করা এবং আন্দোলনে জড়িত বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তোলা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার রাসবিহারী ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, তারক নাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলরতন সরকার, অরবিন্দ ঘোষ এবং

গোপালচন্দ্র সেন

ইন্দ্রানুজ রায়

সেকালের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত চিন্তাবিদরা এবং শিক্ষার্থীরা দেশের হিতে 'জনগণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

> "আন্দোলনকারী ছাত্রদের মানসিকতা কতটা ভয়ংকর হলে শিক্ষা মন্ত্রীকে আক্রান্ত হতে হয়। সেই ক্যাম্পাস শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষকদের জন্য কতটা নিরাপদ?"

এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (এনসিই) কিছু উদ্দেশ্য ছিল। এনসিই বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই কার্যত দুটি বিপরীত মতবাদ এবং মতাদর্শ ছিল এবং শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে পড়াশোনা করবে তা নিয়েও তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে সকলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে বয়কট করার পক্ষে ছিলেন না।

তারকনাথ পালিত এনসিই বেঙ্গলের প্রস্তাবিত ত্রিস্তরীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেননি এবং ৯২ সদস্যের শিক্ষা পরিষদেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (এনসিই) নিবন্ধিত হওয়ার দিন, তারকনাথ পালিত এবং অন্যান্যরা 'কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতি' বা কারিগরি শিক্ষার প্রচারের জন্য সোসাইটি নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন গঠন করেন। এনসিই বেঙ্গলের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ কারিগরি শিক্ষার প্রচারের সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ফলস্বরূপ, এনসিই বেঙ্গল, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল (বিএনসি) প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন, আপার সার্কুলার রোডের বাগানবাড়িতে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অব্যাহত ছিল। ১৯২১ সালে, যখন স্যার রাসবিহারী ঘোষ মারা যান, তখন তিনি তার দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং

আলিপুরে তার বাড়ি আড়াই লক্ষ টাকায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে দান করেন। সেই টাকা দিয়ে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (এনসিই) যাদবপুরে ৩৩ একর (প্রায় ১০০ বিঘা) জমি কিনে নেয় এবং ১৯২২ সালে স্যার আশুতোষ মুখার্জি নতুন ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯২৪ সালে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বর্তমান যাদবপুর ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়, যা কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক তার মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নির্দেশনায় লিজ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে প্রশাসনিক অফিস ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, আনন্দ কুমারস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাধাকুমুদ মুখার্জি, বিনয় কুমার সরকার, সখারাম গণেশ দেওস্কর এবং অন্যান্যদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

১৯২৯ সালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' রাখা হয়। তবে, কলেজ তেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রদের সরকারি চাকরির সুযোগ ছিল না, এমনকী তারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করলেও যা ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। অবশেষে, ১৯৩৯ সালে, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকারের সম্মতিতে, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করে। ১৯৫৫ সালে যাদবপুর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং ত্রিগুণা সেন প্রথম উপাচার্য হন। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে নকশাল আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি এবং অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে, আন্দোলন তুঙ্গে থাকাকালীন রাজনৈতিক হানাহানির মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নকশালপন্থী আততায়ীর হাতে অবসর নেওয়ার দিন তৎকালীন উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেনকে ক্যাম্পাসে হত্যা করা হয়। অকৃতদার শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান ঘটে।

১৯৮১ সালে একটি নতুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও দক্ষতার সঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করে তোলা, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা এবং অধ্যয়নের কোর্সে নির্দেশনা, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং প্রদান করা, জ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি এবং প্রচার করা সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার গঠনতন্ত্রকেও আরও গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল, যা এনসিই, বঙ্গপ্রদেশের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যার একটি দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে ব্রিটিশ সময়কাল থেকে যা বর্তমানে একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিছু স্বার্থপর মানুষদের নিজের বৃহত্তর স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্যে এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের মান অবমাননা করা হচ্ছে। কলুষিত করা হচ্ছে, কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে এর ঐতিহ্য।

সত্তরের দশক থেকেই বামপন্থী নকশালপন্থীদের পীঠস্থান ছিল তার প্রভাব বিস্তার হয়ে বর্তমানে মাওবাদী এবং জঙ্গি সংগঠনের আকৃতি ধারণ করেছে। অমানবিক, অশ্লীল, অসামাজিক এবং দেশ বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার গৌরবময় ইতিহাস মুছে যাবার পথে। কালিমালিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার এক একটি দেওয়াল। ক্যাম্পাসের দেওয়ালগুলি দিনের পর দিন ভরে উঠছে দেশবিরোধী স্লোগানে। দেশবিরোধী কমরেডদের লাল সেলাম লিখনে জানানো হচ্ছে কুর্নিশ।

জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে এখানকার ছাত্রসমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এর প্রমাণ এত দেশবিরোধী স্লোগান। কিছু শিক্ষার্থী যারা বাধ্য হচ্ছে এই সব মেনে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে এই দেশবিরোধী, সমাজবিরোধীদের মধ্যে। আর যারা পারছে না তাদের জন্য রয়েছে র‍্যাগিং নামক বিভীষিকার হাত ধরে মৃত্যু।

ইউজিসি, রুসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড, ইত্যাদি কারোর ক্ষমতা হচ্ছে না এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর নাকি তাদেরও ইচ্ছা নেই? বর্তমান সরকার নির্বাক, পুলিশ প্রশাসন নির্বাক দর্শক। সব রকম নেশা যেমন মদ, গাঁজা, ড্রাগসের আঁতুড় ঘর ওই ক্যাম্পাস। আজকের পরিস্থিতি যা আকার নিচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে দুর্লভ অস্ত্রের ভাণ্ডার যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং তাদের বাবা মায়েরা ভয়ে ভীত। যারা রুখে দাঁড়াচ্ছে তাদের উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, যাকে আর এক ভাষায় বলা হয় র‍্যাগিং করে তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

২০২৪ সালে এই রকমই একটি নির্মম ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল একটি ১৭ বছর বয়সী প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্রকে। নির্মম মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল তাকে হোস্টেলে থাকা কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররা। সেই নির্মম ঘটনা আজও বিচারাধীন।

নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী এখনো অনেক শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে বেছে নিচ্ছে। অন্যান্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় এখানেও ছাত্র রাজনীতি তুঙ্গে। কিন্তু এখানে আসলে ছাত্র রাজনীতির আড়ালে জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের কার্যসিদ্ধ করছে নতুন আহ্বায়ক বানানোর পদ্ধতিতে সক্ষম হচ্ছে তার হাতেনাতে প্রমাণ আজকের বর্তমান পরিস্থিতি। আন্দোলনকারী ছাত্রদের মানসিকতা কতটা ভয়ংকর হলে শিক্ষা মন্ত্রীকে আক্রান্ত হতে হয়। সেই ক্যাম্পাস শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষকদের জন্য কতটা নিরাপদ? শিক্ষা মন্ত্রী আক্রান্ত হবার পরও প্রশাসন নির্বাক। এই পরিস্থিতি যদি শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় তাহলে ভবিষ্যৎ যুবসমাজ, শিক্ষিত সমাজ নিশ্চিতভাবে ধাবিত হবে ধ্বংস হওয়ার পথে। □

বাম-অতিবাম চক্রব্যূহে জাতীয়তাবোধের পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সুদীপ্ত গুহ

সালটা ১৯৫৫। কলকাতায় এলেন ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন। উদ্দেশ্য ভারতের মননে প্রবেশ। ভারতের অঘোষিত রাজধানী তখনো কলকাতা। শিক্ষা-সংস্কৃতির তো বটেই। তাই কলকাতা তাঁদের জন্য সহজ এবং লোভনীয় প্রবেশদ্বার। এছাড়াও অনুশীলন এবং যুগান্তরের যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দামান জেলে ব্রিটিশ লেবার পার্টি এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পত্রিকা পড়ে কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন, তারাও কলকাতায়। বামপন্থী নাট্য সংগঠন কলকাতায়। তাই কলকাতার সংবাদপত্র, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি জগৎ হলো তাঁদের প্রথম টার্গেট। আর শিক্ষা জগৎ বলতে প্রথমেই লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হলো শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নের 'NCE Bengal'। যা আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ধীরে ধীরে এখানে নিজেদের পছন্দের অধ্যাপকদের ঢোকানো শুরু হয়। যেহেতু নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ। তাই সেই কাজে সুবিধা হয়। কিন্তু পুরোনো শিক্ষকরা তো সবাই স্বদেশী। করুণা রায়, অমিতাভ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র গুহ, ত্রিগুণা সেন, গোপালচন্দ্র সেনরা ধুতি পঞ্জাবি বা ধুতি শার্ট পরে আসতেন পড়াতে যখন শিবপুর ছিল সম্পূর্ণ সাহেবদের কলেজ এবং শিক্ষকরা আসতেন কোট টাই পরে। তাই যাদবপুর দখল খুব সহজ হবে এই আশা ছিল না তাদের। এরই মধ্যে ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে প্রবল হয় রাজনৈতিক লড়াই। একের পর এক কারখানা বন্ধ হতে থাকে। ব্রিটিশরা তাঁদের কোম্পানি কম দামে ভারতীয় অসৎ লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের বেঁচে দিলে, চাকরি হারিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা মিলিটারি, ব্যাংক বা বীমা কোম্পানিতে যোগ দেওয়া শুরু করে। শুরু হয় বিক্ষোভ। আর মানুষকে ভুল বোঝানো শুরু করে বিভিন্ন বাম ও অতিবাম রাজনৈতিক দল। ১৯৭০-এ উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে যাদবপুরের স্বদেশী শিক্ষকদের সংকেত দেওয়া শুরু হয়, হয় হাল ছাড়ো, নয় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করো। বন্দুকের নলই ক্ষমতার একমাত্র উৎস।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হলে শুরু হয় একে একে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন থেকে শিক্ষক ঢোকানোর পালা এবং পরের দুই দশকে জেইউটিএ (যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) বা জুটার দখল নেয় সিপিএম। সিপিএম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নকশালদের রেখে দেয় বাফার জোন হিসেবে, যাতে এবিভিপি বা ছাত্র পরিষদ বা ডিএসও এখানে খাতা না খুলতে পারে। ছাত্র সংগঠন নকশালদের এবং তার বদলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এসএফআই যাবে। যদি কোনো ছাত্র-ছাত্রী বিরোধিতা করে তবে তাকে খারাপ নাম্বার দিয়ে তার কেরিয়ার খারাপ করে দেওয়া হবে। নইলে আটকে দেওয়া হবে স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি ডিগ্রী। অথচ বজায় থাকবে নকশাল এবং সিপিএমের যুদ্ধ যুদ্ধ নাটক।

এদিকে কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে তৃণমূল যেহেতু সিপিএমের সঙ্গে একটা সেটিং রাখে, তাই নকশালদের কেউ ঘাঁটায়নি। যদিও ২০১১-তে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসে তাদের উপড়ে ফেলার চেষ্টায় উপাচার্য করে নিয়ে আসেন ড. অভিজিৎ চক্রবর্তীকে। শুরু হয় বিভিন্ন অডিট এবং তদন্ত। এবার বামপন্থী শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেপায় এবং শুরু হয় 'হোক কলরব' আন্দোলন। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের বেশ কিছু নেতা ফেঁসে যায় সারদা-সহ বিভিন্ন চিটফান্ড কেসে। তখন মমতা ব্যানার্জি নকশালদের খুশি করতে বলি দেন ড. চক্রবর্তীকে। উপাচার্য হিসেবে আনা হয় ধূর্ত এবং মেরুদণ্ডহীন সুরঞ্জন দাশকে যিনি একেবারে আলিমুদ্দিনের খাস লোক। ছাত্র-ছাত্রীদের খুশি রাখতে সব রকম উচ্ছৃঙ্খলাতে ছাড় দেওয়া হয়। সব রকম নেশা, র‍্যাগিং, পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতন থেকে সমকামী অভিযোগে হত্যা। ছাত্ররা সমাবর্তনে আচার্যকে অপমান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অসম্মান ইত্যাদি শুরু করে। আর শেষ অধ্যায় ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন হয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে আক্রমণ। অবশ্য এই আন্দোলনের কারণ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্কুলে কলেজে জেহাদিদের দ্বারা সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়ার খবর থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া।

ঋষি অরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, সুবোধ মল্লিকদের স্বপ্ন এভাবে শেষ হতে দেওয়া হয় না। যাদবপুরের আলিমুদ্দিন থেকে চাকরি পাওয়া অযোগ্য শিক্ষকদের তৈরি সংগঠনটি আগে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি ইত্যাদি হওয়ায় বাধা দিয়েছে যাদবপুরকে। কারণ দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের যেকোনো বিষয় ১০০ শতাংশ ইংরেজিতে পড়ানো এদের পক্ষে অসম্ভব। মৌলিক গবেষণা এদের দ্বারা অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রতি Institute of Eminence -এর স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব দিলে সেটিও নাকচ করে দেয় মমতা ব্যানার্জির সরকার এবং তাতে শিক্ষক-ছাত্র সবাই থাকে চুপ। কারণ JEE Advanced পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা এলে নকশালবাদ এখানে উঠে যাবে এবং শিক্ষকদেরও পড়াশোনা ও গবেষণায় জোর দিতে হবে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একজোট হয়ে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ফের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে হবে। □

ভাতা সংস্কৃতি : ভোটের রাজনীতি নাকি অর্থনীতির আত্মঘাতী ফাঁদ?

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের রাজনীতিতে এখন একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে— ভোটের আগে বিভিন্ন ভাতা ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে এবং প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এখন জনগণকে সরাসরি আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। একসময় কেবলমাত্র দক্ষিণের কিছু রাজ্যে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এটি দেখা যেত, কিন্তু এখন এটি সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অসম-সহ দেশের প্রায় সব রাজ্যে ভোটের আগে নানা ধরনের ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শোনা যায়। যেন প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলিতেও দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলি জনগণকে অর্থনৈতিক সুবিধার লোভ দেখিয়ে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিনামূল্যে রেশন, বেকার ভাতা, গৃহহীনদের জন্য বিনামূল্যে ঘর, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ, কৃষিঋণ মকুব, মহিলাদের জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান, এমনকি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ প্রদান। এগুলোর মধ্যে কিছু প্রকল্প নিঃসন্দেহে দরিদ্র জনগণের জন্য সহায়ক হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে এসব সুবিধার প্রভাব কতটা ইতিবাচক, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলছেন।

রাজনৈতিক দলগুলির যুক্তি হলো, এসব প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এসব ভাতা এবং অনুদান বাস্তবিক অর্থে স্বল্পমেয়াদী সুবিধা দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভাতা প্রদানকারী রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের ঋণের বোঝা বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাতার রাজনীতি অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। একদিকে সরকার বিনামূল্যে সুবিধা দিচ্ছে, অন্যদিকে সেই অর্থের সংস্থান করতে নতুন কর আরোপ করতে হচ্ছে বা ঋণ নিতে হচ্ছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষ করে যেসব রাজ্য ইতোমধ্যেই রাজস্ব ঘাটতির মুখোমুখি, সেগুলির ক্ষেত্রে এই প্রবণতা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা এসব ভাতা পায়, তাদের একটা বড়ো অংশই কর্মসংস্থানের চেষ্টা কমিয়ে দেয়। সহজে টাকা পেলে শ্রম করার ইচ্ছা কমে যায়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কর্মসংস্থান তৈরি না হলে দীর্ঘমেয়াদে দেশ অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, যদি সরকার সত্যিই দরিদ্রদের সাহায্য করতে চায়, তবে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। বিনামূল্যে টাকা দেওয়া বা ঋণ মকুব করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

এই ভাতা সংস্কৃতির একটি বড়ো সমস্যা হলো, এটি দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা এই ভাতার সুবিধা পান না, বরং রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই এই সুবিধাগুলি পান। এছাড়া, বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ভাতা পরে কার্যকর হয় না। জনগণকে ভোটের লোভ দেখানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে সরকার নানা অজুহাতে তা বাস্তবায়ন করে না।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালাম একবার বলেছিলেন, 'দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে নাগরিকদের স্বনির্ভর হতে শেখাতে হবে, তাদের কাজের সুযোগ দিতে হবে। বিনামূল্যে সুবিধা দিলে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যা একটি দেশের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে।' অর্থাৎ বাস্তবসম্মত উন্নয়ন চাইলে সরকারের উচিত বিনামূল্যে সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, যাতে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এই প্রসঙ্গে চীনের দার্শনিক লাওৎসির বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে— 'যদি কাউকে একদিনের জন্য সাহায্য করতে চাও, তবে তাকে মাছ দাও। আর যদি সারাজীবন সাহায্য করতে চাও, তবে তাকে মাছ ধরা শেখাও।' ভারতীয় রাজনীতিবিদদের এই কথাটি বোঝা উচিত।

সরকার যদি সত্যিই সাধারণ মানুষের উন্নয়ন চায়, তাহলে বিনামূল্যে ভাতা প্রদান বন্ধ করে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। শিক্ষার প্রসার, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন— এসবের দিকে জোর দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে, তবে সেটি হতে হবে স্বল্পমেয়াদী এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক।

এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলির ভাতা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকা প্রয়োজন। ভারতের নির্বাচন কমিশন যদি এই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলির উপর নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করে এবং প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট যদি এই বিষয়ে নির্দেশ দেয়, তাহলে এই প্রবণতা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলির উচিত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া এবং স্বল্পমেয়াদী জনপ্রিয়তার জন্য দেশের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে না ফেলা।

ভাতা সংস্কৃতি সাময়িক স্বস্তি দিলেও, এটি দীর্ঘমেয়াদে দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল কর তুলবে। তাই এখনই সময় এসেছে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার। সরকারের উচিত নিনামূল্যে সুবিধা দেওয়ার বদলে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করা, যাতে মানুষ নিজের যোগ্যতায় স্বনির্ভর হতে পারে। কেননা, একটি দেশ তখনই প্রকৃত অর্থে উন্নত হয়, যখন তার নাগরিকরা পরনির্ভরশীল না থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

(লেখক একজন আইনজীবী)

হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র মতে ‘সতী’ নারী কে?

যশস্বিনী দাশগুপ্ত

মানুষ সমাজে সম্মান লাভ করতে চায়। কেউ বৃহত্তর সমাজে সম্মান লাভের আশা করে, কেউ নিজের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে চায়। যদি সমাজে নারীর সম্মানের প্রসঙ্গে আসি, তাহলে বলা যায় হিন্দু সমাজে ‘সতী নারীর’ একটি বিশেষ সম্মান রয়েছে। কিন্তু ‘সতী নারী’ এই শব্দটির সঠিক অর্থ বহু মানুষেরই অজানা। কেবল শারীরিক পবিত্রতার মাপকাঠিতে নারীর সতীত্বকে বিচার করে সমাজ। কিন্তু এই একটি নাম ‘সতী’ শব্দের সম্পূর্ণ অর্থকে বহন করে না।

যে নারী পতিব্রতা, যে নারী স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গ কখনো করেননি— সেই নারীকেই সমাজ ‘সতী নারী’ আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু ‘সতী’ শব্দটির গভীরতা অনেক বেশি। সনাতন শাস্ত্র মতে, ‘সৎ’ শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ হলো ‘সতী’। একজন ব্যক্তির মধ্যে যে যে গুণাবলী থাকলে তাকে ‘সাধু’ বলা যায়; একজন নারীর মধ্যে ঠিক সেই সেই গুণাবলী থাকলে তাকে ‘সতী’ বলা যায়। একটি সাধুর সর্ব বৃহৎ গুণ হলো, তিনি জিতেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সকল রকম আকর্ষণকে যিনি নিত্য সৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তিনিই সাধু। এ জগতের সব কিছুই নশ্বর, অনিত্য। জগতের সব কিছুরই একটি শুরু এবং একটি শেষ আছে। পরম ঈশ্বরই একমাত্র অনিত্য। তার কোনো শুরু ও শেষ নেই। তার সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। সেই নিত্য পরমেশ্বরের সঙ্গে যিনি নিয়ত যুক্ত থাকেন, তিনিই সাধু। কোনো নারীর মধ্যে এই সকল বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেলে, তাকে ‘সতী’ বলা যায়।

‘সতী’ ও ‘পতিব্রতা’ শব্দদুটি এক নয়। আমরা বহু সময় ‘সতী’ ও ‘পতিব্রতা’ শব্দদুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু ‘পতিব্রতা’ নারী তাকেই বলা হয়, যিনি নিজের স্বামী ছাড়া কোনোদিন দ্বিতীয় পুরুষের কামনা করেননি। অপরপক্ষে, ‘সতী’ শব্দটির গুরুত্ব আরও ব্যাপক। ‘সতী’ স্ত্রী চিরকাল তার স্বামীকে পরমেশ্বর জ্ঞানে ভালোবেসেছেন, সেবা করেছেন। তিনি ‘সতী’ স্ত্রী। পতিব্রতা নারী কেবল স্বামীকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু ‘সতী’ স্ত্রী নিজের স্বামীকে পরমেশ্বর জ্ঞানে সেবা করেছেন। সনাতন শাস্ত্র মতে, তিনিই ‘সতী’।

আমরা যদি পুরাণ ও ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, কুন্তী, দ্রৌপদী, অহল্যা, মন্দোদরী, তারা-ইতিহাস ও পুরাণের এই পাঁচ নারীকে ‘পঞ্চকন্যা’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ‘পঞ্চকন্যা’ ছিলেন পতিব্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণা।

আবার তাঁরা একাধিক পুরুষের সঙ্গ করেছেন। এই পঞ্চকন্যাকে হিন্দুসমাজে প্রাতঃস্মরণীয়া ও মহাপাতকনাশিনী বলা হলেও, ‘সতী’ বলা হয়নি। ‘পঞ্চসতী’ বলা হয়েছে, সীতা, সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং দেবী অরুন্ধতীকে। তাঁরা শুধু পতিব্রতা ছিলেন, তা নয়; নিজের স্বামীকে এই ‘পঞ্চসতী’ পরমেশ্বর জ্ঞানে সেবা করেছেন। স্বামীর মধ্যে তারা তাদের ইষ্টদেবকে দর্শন করতেন। অর্থাৎ এই কর্মে তারা নিত্য পরমেশ্বর সৎ এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতেন। কারণ মানুষ যার সঙ্গে দিনরাত অতিবাহিত করছে, তাকে যদি সে পরমেশ্বর জ্ঞান করে তাহলে সেই মানুষটি কোনো সময়ই পরমেশ্বর থেকে পৃথক হচ্ছেন না। তিনি সকল সময় সেই ‘সৎ’-এর সঙ্গেই যুক্ত থাকছেন। স্বামীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে নিত্য সেবা করায়, সতী নারীর জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে অনিবার্য মুক্তি ঘটে। কিন্তু একজন পতিব্রতা স্ত্রী-র তা ঘটে না।

সুতরাং, ‘পতিব্রতা’ শব্দটির থেকেও ‘সতী’ শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। শরীরের পবিত্রতাও ‘সতী’ শব্দটির পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যিনি নিয়ত ‘সৎ’-এর সঙ্গে যুক্ত, তিনিই সতী। □

কিডনি সুস্থ রাখতে এই ফলগুলি খান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কিডনি আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ দূর করে। পাশাপাশি শরীরের জল ও ইলেকট্রোলাইটের (সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি) ভারসাম্য বজায় রাখতে এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিশেষ হরমোন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। শরীরের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণেও কিডনির গুরুত্ব অনেক এবং এর ফলে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয়। তাই কিডনিকে সুস্থ রাখতেই হবে। বেশ কিছু ফল আছে, যেগুলির মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার বা আঁশ, পর্যাপ্ত ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে। আর এসব ফল খেলে কিডনি থাকবে সুস্থ। এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো :

(১) তরমুজে প্রচুর জল থাকায় শরীরকে ডিহাইড্রেট হতে দেয় না এবং শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে কিডনির কার্যকারিতা ভালো থাকে। লাইকোপিন ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় তরমুজ কিডনির কার্যকারিতা সহজতর করে। তরমুজে পটাশিয়াম খুব কম থাকে বলে কিডনি রোগীদের জন্য নিরাপদ।

(২) লেবুতে আছে প্রচুর সাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড ঘন ঘন প্রস্রাব হতে সহায়তা করে। আবার ক্যালসিয়াম অক্সালেট জমে যাওয়া প্রতিরোধ করে লেবু। এই ক্যালসিয়াম অক্সালেট কিডনিতে পাথর তৈরি করে। অর্থাৎ কিডনিতে পাথর তৈরি করে। অর্থাৎ কিডনিতে পাথর প্রতিরোধে লেবু বেশ সহায়ক। এছাড়া লেবু শরীর থেকে সব ধরনের টক্সিন দূর করতেও কার্যকর।

(৩) আনারসে আছে প্রচুর পরিমাণে জল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা কিডনির কার্যকারিতা ভালো রাখতে সহায়তা করে। এতে থাকা ব্রোমেলিন এনজাইম প্রদাহ কমায়, যা কিডনির সঠিক কার্যকারিতার জন্য উপকারী। এছাড়া এতে ভিটামিন-সি ও পটাশিয়াম আছে, যা শরীরের দূষিত পদার্থ দূর করতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তবে কিডনির রোগ থাকলে আনারস খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(৪) আপেল কিডনির জন্য খুবই উপকারী। এতে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ, ভিটামিন-সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে, যা শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এবং কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে। এতে পটাশিয়াম কম বলে কিডনি রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এছাড়া আপেল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা কিডনির সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) ডালিম বা বেদানা কিডনির জন্য উপকারী। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন-সি, ফাইবার বা আঁশ এবং বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদান আছে, যা কিডনির প্রদাহ কমায় এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়ক।

(৬) পেঁপেতে আছে প্রচুর ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার বা আঁশ, এছাড়া পেঁপেতে প্যাপেইন নামক এনজাইম থাকে, যা কিডনির সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পেঁপে শরীর থেকে টক্সিন বা দূষিত পদার্থ দূর করতে সহায়ক। পেঁপে হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং প্রদাহ কমায়, যা কিডনির জন্য ভালো।

(৭) আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ ও জল থাকে, যা কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে। আঙুর শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এবং প্রদাহ কমায়, যা কিডনির জন্য ভালো। এছাড়া এতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও রেজভেরাট্রল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা কিডনির কোষকে সুরক্ষা দেয়। তবে কিডনি রোগে আক্রান্ত বা পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আঙুর খাওয়া উচিত। কারণ এতে পটাশিয়ামও থাকে। □

যাদবপুর আছে যাদবপুরেই কিন্তু আর কত দিন?

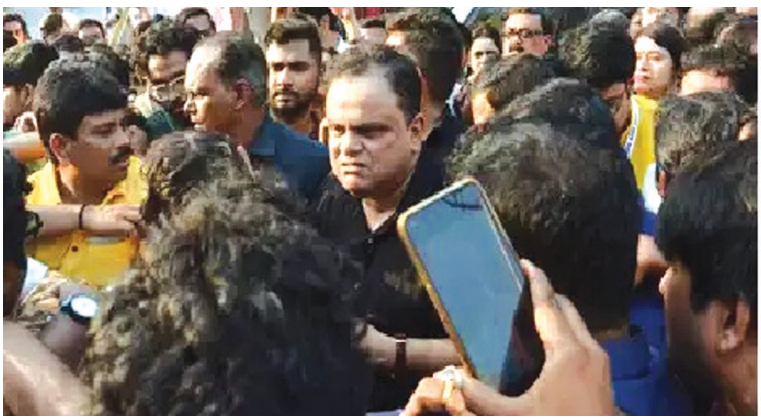

বামপন্থার মস্তিষ্ক আজ যাদবপুরে বড়ো ভারাক্রান্ত। প্রগতিশীলতার আড়ালে স্থবিরতাই এদের সম্পদ। গণতন্ত্রের নামে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, ঠিক তখন কিছু অর্বাচীন সেই দিবাস্বপ্নে হয়েছে বিভোর।

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, 'বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। বিদ্যা আবরণে, শিক্ষা আচরণে।' ১৯৬৭-র রক্তমাখা দিনগুলি থেকে শিক্ষার অবনমন অব্যাহত। একদা শিক্ষায় অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অবদমিত ও পশ্চাৎপদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। 'বুর্জোয়া' শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস, শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে সম্পন্ন মানুষকে খতম করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের হত্যা। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্রদের দ্বারা। এই নৃশংস কাজ যারা করেছে, তাদের শাস্তি না দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার মাধ্যমে এই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে লাল সন্ত্রাসকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এরপর এলো শ্বেত সন্ত্রাসের হাত ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে বসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষা দেওয়া, শিক্ষাবর্ষ পেছোনো, গণটোকাটুকির মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সামনে ছাত্র বিক্ষোভের নামে জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির ওপর নৃত্যের যে মহড়া শুরু হয়, তা আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, উপাচার্যের গাড়ির ওপর পাদুকা রাখা-সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ওপর অতিবামপন্থার উগ্র আগ্রাসন ইত্যাদি কার্যকলাপের দ্বারা বিদ্রূপাত্মকভাবে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। নিজ সৃষ্ট সংস্কৃতির শিকার হন শিক্ষামন্ত্রী। আর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে ছাত্র চাপা পড়ায় কোর্ট নির্দেশিত এজাহার হয় শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

১৮৫৭ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ স্ট্রিট-স্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যান্য ক্যাম্পাস থেকে বিযুক্ত থেকে বিভিন্ন অরাজক আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে দানা বাঁধতে দেয়নি। যদিও প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসে সীমায়িত হওয়ার দরুন সেখানে নানা বিক্ষোভ দ্রুত দানা বেঁধেছে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় ১৯০৬ সালের ২৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যা ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাম আমলে 'অনিলায়ন'-এর ফলে বহু বামপন্থী ছাত্র শিক্ষকের বেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জায়গা করে নিয়েছে। একথা ভুললে চলবে না যে, অমর্ত্য সেনেরও যাদবপুরের শিক্ষকতা খুব একটা সুখকর ছিল না। বর্তমান সরকারের কর্ণধার একদা রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাইতেন, আজ তারই শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুরের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যান না। যান নিজেদের রাজনীতির ধারক-বাহক ওয়েবকুপার সভায় বক্তৃতা করতে।

ইতিপূর্বে ছাত্রীর শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে 'হোক কলরব'-এর শিকার হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী। পরবর্তী পর্যায়ে বাম-মনস্ক ড. সুরঞ্জন দাস উপাচার্য থাকবার সময় উচ্চগ্রামে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়নি, কিন্তু সেই আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে। ২০২২ সালে যাদবপুরে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুতে র‍্যাগিঙে বাম-অতিবাম প্রাক্তনীদের যোগসূত্র পাওয়া যায়। স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পরেও ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস্ কমিটি বা আইসিসি-র

সুপারিশ করা যায়নি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। সিসিটিভিতে গোপনীয়তা ও ব্যক্তিপরিসর ব্যাহত হবে এই অজুহাত তুলে এই সুপারিশসমূহ পুরোপুরি কার্যকর করা হয়নি। বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অস্থায়ী উপাচার্য ড. ভাস্কর গুপ্ত ছুটিতে রয়েছেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাজ্য-রাজনীতিতে বামেরা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। রাজ্যের শাসক দল ও কেন্দ্রীয় শাসক দলের মধ্যের লড়াই হয়ে উঠেছে এই রাজ্যের রাজনীতির মূল উপজীব্য। মনে পড়ে, ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জেলবন্দি অবস্থায় কাশ্মীরে মারা যান। ১৯৫৩ সালের ২৪ জুন যে শোকযাত্রা কলকাতা দেখেছিল, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে তা অন্য ছবি আঁকতে পারত। কিন্তু তাঁর প্রয়াণের মাত্র এক সপ্তাহ পরে ওই বছরের ১ জুলাই এক পয়সা ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ট্রাম-বাস জ্বালিয়ে দিয়ে বামপন্থীদের হিংসাত্মক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে।

রাজ্য-রাজনীতি ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বামেরা গত এক দশকে ধুয়ে মুছে গিয়েছে। রাজ্যের শাসক দল যখন কেন্দ্রীয় শাসক দলের কাছে রীতিমতো কোণঠাসা, সেই অবস্থায় বামপন্থাকে অক্সিজেন জোগাতে যাদবপুরের মাটিতে ব্যবহার করতে চাইছেন রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষ নেত্রী। এই সময় শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুরে দলীয় রাজনীতির ধ্বজা ওড়ানোর ব্যর্থ পরিহাস করছেন কেন? যেকোনো শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা ও বক্তৃতাতে সীমাবদ্ধ থাকে। যারা বাম কিংবা অতিবাম— তিয়েন- আন মেন স্কোয়ারে ট্যাঙ্ক চালালে তারা প্রতিবাদ করে না, কারণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে তা সম্পন্ন হয়েছে। তার পরিবর্তে যাদবপুরে স্লোগান ওঠে, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি', 'মুঝে আজাদি চাহিয়ে', 'প্যালেস্তাইনের লড়াই আমাদের লড়াই'। এর মধ্যে অনেকগুলি স্লোগান তেহরান থেকে প্রকাশিত 'ইকো অফ ইসলাম'-এর প্রতিধ্বনি। মুক্ত আলোচনা হোক, আলোচনার পরিসর উন্মুক্ত হোক— নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ছাত্র রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশবিরোধী শক্তির অবাধ বিচরণ বন্ধ হোক।

২০১৭ সালের পর রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ। অন্যদিকে, শাসক দলের ছাত্র সংগঠন ও বহিরাগতরা কলেজগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। যোলো আনা রাজনীতিকরণের মধ্যে দিয়ে চলছে ছাত্র সংসদের অর্থ লুঠ। যাদবপুরে শেষ নির্বাচন হয়েছে ২০২০ সালে। ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর হয়নি। হরিমোহন কলেজের নির্বাচনে পুলিশ নিহত হওয়া, কিংবা আশুতোষ কলেজে নির্বাচনের দাবিতে ছাত্র মৃত্যু— এক সর্বগ্রাসী শূন্যতা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের ক্রম-অবনমন ত্বরান্বিত করছে।

নব্বইয়ের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. সন্তোষ ভট্টাচার্যের দিনলিপি— 'Red Hammer over Calcutta University' বইটিতে বাম আমলের শিক্ষার বিপর্যয়ের বিষয়টি বর্ণিত হয়। অথবা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এই প্রতিবেদক রচিত পুস্তিকা 'শিক্ষার অন্তর্জলিযাত্রা' তুলে ধরে বর্তমান সময়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পঠন পাঠনের জন্য নয়, রাজনৈতিক আস্ফালনের জন্য। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথায় 'মমতাপন্থী' বা 'মমতাবাদী' হওয়ার জন্য। পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা দুর্নীতিতে জেলে। পর্ষদ সভাপতি জেলে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য জেলে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জেল ফেরত হয়ে বিচারপ্রাপ্তির অপেক্ষায়। হাজার হাজার ছাত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই রাজ্যে ৩, ৬০০-রও বেশি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে ৫০০ মাদ্রাসা তৈরির বাজেট রচিত হয়। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ, তারপর ধাপে ধাপে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সিরিয়াতে পরিণত করার নিখুঁত পরিকল্পনা চলছে। বামপন্থা এবিষয়ে নিশ্চুপ! তাদের এই মৌনতা হলো সম্মতির লক্ষণ। শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতির চারণভূমি না বানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে অবিলম্বে সব পক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই রাজ্যের শিক্ষার রাহুমুক্তি ঘটবে।

রুশবিপ্লবের আগে ১৯১১ সালে রুশ স্থপতি থমাস লেরোয় নির্মিত ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'দ্য ওয়েট অফ থট্' মস্কোয় স্থাপিত হয় চিন্তায় ভারাক্রান্ত মস্তিষ্কের কথা মনে করাতে। বামপন্থার মস্তিষ্ক আজ যাদবপুরে বড়ো ভারাক্রান্ত। প্রগতিশীলতার আড়ালে স্থবিরতাই এদের সম্পদ। গণতন্ত্রের নামে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, ঠিক তখন কিছু অর্বাচীন সেই দিবাস্বপ্নে হয়েছে বিভোর। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার এত অবক্ষয় হয়েছে যে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে বিধানসভায় বলতে হয়, চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কলেজগুলিতে অর্ধেক আসন ফাঁকা। তাই রাজ্যে নতুন করে কলেজ তৈরির প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এর অন্যতম কারণ হলো প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ দুর্নীতির পাঁকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যোগ্যরা রাস্তায়, অযোগ্যরা ক্লাসরুমে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ চাকুরীর সম্ভাবনা এই সরকার নষ্ট করেছে। ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা আজ নিম্নগামী। রাজ্যে ৮,০০০-এর মতো রুগ্ন স্কুলের মধ্যে ৩,৬০০ স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হবে বলে সরকারি তরফে ঘোষণা করাও হয়েছে এবং বাকি স্কুলগুলি বন্ধের অপেক্ষায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০০ ডিগ্রি কলেজের অর্ধেক আসন ফাঁকা থাকার অর্থ ভবিষ্যতে কয়েকশো কলেজ বন্ধ হওয়ার পথে। ইতিমধ্যেই কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক রয়েছেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী নেই। আবার বহু বিষয়ের ছাত্র আছে, কিন্তু শিক্ষক নেই। শিক্ষায় নাট্যকার শিক্ষামন্ত্রীর আনুকূল্যে কুনাট্য রচিত হচ্ছে। আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দলতন্ত্র। এখন সেই দলতন্ত্রকেও অতিক্রম করে দাসতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি আজ বেশি মনোযোগী। সার্বিকভাবে শিক্ষার মান, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার পরিবেশ বার বার ব্যাহত হচ্ছে। 'বিদ্যা আবরণে, শিক্ষা আচরণে'— কবে যে প্রতিভাত হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

(লেখক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

এবার যাদবপুরের আরবান নকশালদের বিরুদ্ধেই হোক

‘হোক কলরব’

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা পড়েছিলাম আমাদের বিদ্যা দৈবী। বিদ্যা ভ্রম কাটায়। কিন্তু আজ উলটো পুরাণের পালা। দেখছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম অতিবাম এবং অতি অবশ্যই রাজ্য শাসক তৃণমূলের অধীনে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপদার্থ, গৌরবহীন, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আখড়া হয়ে উঠেছে। উপচে পড়ছে কেলেঙ্কারি, ঔদ্ধত্য, ছাত্রবিক্ষোভের নামে বেলেল্লাপনা। হচ্ছে বাম ছাত্র বিক্ষোভ — কেন ছাত্র নির্বাচন নেই? যথাযথ কথা। কেন নেই। কিন্তু যেই বিক্ষোভ শুরু অমনি ঝকমক করে উঠল আসল রাজনৈতিক জিন। ধিক ধিক ধিক্কার হলেই কেমন যেন জাদুবলে আরবান নকশাল আত্মা প্রবল পরাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে নিজের ভাষা বিপ্লব করে। সেই বিপ্লবে কলরব তোলে— হাম ক্যা মাঙ্গে আজাদি, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, ফিলিস্তিন মাঙ্গে আজাদি... ভারি সিলেকটিভ অতি প্রখর স্বঘোষিত ইনফিউসন সিগারেট মাদকের ঘোরে আচ্ছন্ন বিপ্লব।

যে বিপ্লব কখনো ভুল করেও বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য একটা আওয়াজ তোলে না। বিপ্লব স্থগিত থাকে বালুচ প্রদেশে পাকিস্তানি আক্রমনের বিরুদ্ধে। দেওয়াল লিখনে কালি জোটে না পুলওয়ামায় জঙ্গিদের হাতে ভারতীয় সেনারা বীরগতিপ্রাপ্ত হলে। যেখানে রাষ্ট্রবোধের বিষয় সেখানেই অনুপস্থিত, তারা আরবান নকশাল। যারা আজমল কাসভের জন্য কেঁদে

ভাসায়, সেই বিকৃতবোধসম্পন্ন নেশার নাম আরবান নকশাল। তাদের পূর্ব ভারতের মূল ক্যাম্পাস অলিখিতভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স এ রাজ্যে নতুন কোনো ঘটনা না। কিন্তু তা যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক মদতে হতো, তার সঙ্গে সহমত হই বা না হই কিন্তু তাকে সাংবিধানিক সৌন্দর্য বলে ধরে নিতাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অপশক্তি দীর্ঘ সময় ধরে বাসা বেঁধেছে তা কোনো রাজনৈতিক শক্তি না, তা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি। ছাত্র রাজনীতিতে মারপিট, খানিক ঔদ্ধত্য, খানিক অমান্যতা, কিছুটা লাগামহীনতা থাকবে। অপছন্দ হলেও থাকবে। কলকাতার বাঙ্গালিরা এ সবের সঙ্গে পরিচিত।

> যাদবপুর সেই পরাসক্ত প্রজাতির রাজনৈতিক অভ্যাস অনুশীলন করতে আহ্বান করে। মমতার পুলিশ প্রশাসন তাদের ভ্যাকসিন এখনো হতে পারেনি।

স্বাধীনতার আমল থেকেই প্রেসিডেন্সি কিংবা সিটি কলেজ সর্বত্র শাসন তোয়াক্কা না করার তীব্র ভঙ্গি। তা থাকে বলেই রাজনীতির অঙিনা নতুন মুখ পায়। কিন্তু যাদবপুর যে জঘন্য মনোবৃত্তি পোষণ করছে, বাম ব্যানারের আড়ালে যেভাবে সক্রিয় রাষ্ট্রবিরোধী মন্ত্রনা, তা তাদের রাজনৈতিক চেষ্টা অকৃতার্থতা হেতু মরিয়া প্রতিহিংসাও বলা যায়।

সাতের দশকের সেই অভিশপ্ত ৩০ আগস্ট। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার গোপাল সেন তাঁর ঘরে কিছু কাজে ব্যস্ত। পরদিন তাঁর কর্ম অবসরের ঘণ্টা। নকশাল ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিল। স্যার তাতে সম্মতি দেননি। সেই ক্যাম্পাস রেডিয়েন্সে ১০০ মিটারের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর পরেও কি বলা যায় এরা সমাজ সংস্কারী ছাত্র?

সেই লিজেসিই আজ যে কোনো অছিলায় প্রো-পাকিস্তানি, প্রো-ফিলিস্তিনি পোস্টার ধরে। আওয়াজ তোলে। ওরাই স্বপ্নদীপের মতো নীরিহ ছেলেদের ছাত্রাবাসে মানুষের মর্যাদায় থাকতে দেয় না। মানসিক, শরীরিক, যৌন আর যত রকম হেনস্থা করা যায় সব করে। ওরাই ক্যাম্পাসে নজরবন্দি ক্যামেরার তীব্র বিরোধিতা করে। বাম,

অতিবাম, আরবান নকশাল এদের মধ্যে সূক্ষ্ম তফাৎ তা জানি না।

দেশের কোনো সুস্থ নাগরিক বোধ হয় এই রাষ্ট্রশত্রুবৃত্তিধারী রাজনৈতিক ছাত্রদের ভণ্ডামি নীতিতে আগ্রহী না। কিন্তু হিন্দু বিরোধ, রাষ্ট্রবাদী পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের বিরোধ, রাষ্ট্র একটা শোষণযন্ত্র এই মতবাদে ওদের সবার মধ্যে একটা দারুণ মিল। বাম ছাত্ররা তো নির্বাচন হবে কিনা এই মর্মে বিদ্রোহী। কমরেডদের দাবি ন্যায্য। তাহলে যাদবপুরের তিন নম্বর গেটে যখন আজাদ কাশ্মীর গ্রাফিক্স ফুটে ওঠে, সব মিডিয়া সংবাদ করে, তখন কেন বামপন্থী মুখপাত্র বলে না- আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা এসব রাষ্ট্র পরিপন্থী কথার বিরুদ্ধে বলছি— হোক কলরব! কখনই ওরা তা বলবে না। অতএব রাজনৈতিক উপপাদ্য প্রমাণ করছে বাম, নকশাল সবার ঔদ্ধত্য সৃষ্টির প্রাঙ্গন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ওরা সবাই এক--- CPM-এর SFI, CPIML-এর AISA, SUCI-এর DSO এবং মাওবাদীদের USDF এই সব বামপন্থী ছাত্র সংগঠন হাত ধরে চলে। ২০১৬ সালে যখন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ক্যাম্পাসে তার উপস্থিতি জানান দেয় তখন ওরা সবাই জোটবদ্ধ হয়ে আজাদি আজাদি স্লোগান তোলে। আদর্শগত তফাৎ থাক, সেটা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু সেই আদর্শের জোরে ওরা সেদিনও বলেছিল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', আজকেও বলছে আজাদি চাই, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি। স্পষ্ট কথা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নকশাল ও মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল। সেই ক্যাম্পাসে যদি গণতন্ত্রের পাল্লায় বিশ্বাস রেখে একটা তুলসী গাছও রোপণ করি তাহলেও শ্লোগান উঠবে— আজাদি।

সদ্য যে ঘটনা ঘটল যাদবপুরে, তার ওপর ভিত্তি করে কিছু আলোচনা করা যাক। ওয়েবকুপার সম্মেলন চলাকালীন অশান্ত পরিবেশে এক কর্মসূচীতে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বাম ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভ। সংসদের নির্বাচন করতে হবে বলে শ্লোগান তুলল। ১ মার্চ মন্ত্রীর গাড়ি ঘেরাও, অগ্নি সংযোগ নিয়ে প্রবল উত্তেজনা দেখা গেল। মোড় ঘুরে গেল যখন ইন্দ্রানুজ নামের বামপন্থী ছাত্র ব্রাত্য বসুর গাড়িতে আহত হলো। একজন ছাত্রের যেকোনো প্রকার ক্ষতিই দুঃখজনক। ইন্দ্রানুজ দুর্ঘটনার পর বেশ কিছু বিষয়ে খটকা তৈরি হয়েছে। ইন্দ্রানুজ কি সত্যিই বামপন্থী? যদি তাইই হয়, তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর ৮ আগস্ট সে একটা পোস্ট করেছিল, 'Death of a Hypocrite, Death of a Tyrant' এখানেই শেষ না, সে 'কুকুর' পর্যন্ত লিখতে ছাড়েনি।

ইন্দ্রানুজ রায় কে? সাধারণ কথায়— ও কোন হরিদাস পাল! কিন্তু ইন্দ্রানুজের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটল বলেই প্রশ্ন আবারও ঘনীভূত হচ্ছে আমাদের রাজ্যের রাজধানীর বুকে এমন এক শিক্ষাঙ্গন। মমতা ব্যানার্জির শাসনকাল, যিনি গর্ব করে বলেন, মাওবাদীদের তিনিই নাকি পরাস্ত করেছেন। তাহলে কোন দৈববলে এই ছেলেগুলো মাওবাদী ঘুন লালন করছে! রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স কি তবে ব্যর্থ? মমতা ব্যানার্জি পুলিশ মন্ত্রী। তিনিই স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পর যাদবপুরকে বলেছিলেন— আতঙ্কপুর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল কি তবে ছেড়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। দিনের পর দিন মাওবাদীদের ডেরা কেমন করে হয়? সরকার কী চায়?

আমরাও তো আজাদি চাই--- এই সুরক্ষাহীনতা থেকে, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির হাত থেকে। তৃণমূল-মাওবাদী সম্পর্ক কিন্তু সারা রাজ্য দেখেছে। লালগড়ের ত্রাস মাওবাদী নেতা ছত্রধর মাহাত কালক্রমে তৃণমূলের সম্পদ হয়ে ওঠেন। দশ বছর কারাজীবন শেষে ছত্রধর তো তৃণমূলের উন্নয়ণে আপ্লুত হয়ে যায়। রাজ্য কমিটিতে স্থান হয়। বীজপুর সুকমা সীমান্তে মাওবাদীদের দমন করা যাচ্ছে কিন্তু যাদবপুরে আরবান নকশাল, মাওবাদীরা অবধ্য। এটা কি রাজ্য সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত নয়?

১৯৮০ থেকে যে কলকাতা 'অকালের সন্ধানে' ছুটছিল সেই কলকাতার বুকে এত বড়ো অকাল নৈরাজ্য! নাম যাদবপুর। আমরা যেন ভুলে না যাই যে ভঙ্গিতে বামপন্থী ছাত্ররা রাজ্যপালকে অসম্মান করে, সেই একই ভঙ্গিতে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও আক্রমণ করেছেন। তিনি রাজ্যপাল জগদীশ ধনকরকে কখনো 'নৈরাজ্যপাল' বলেন তো কখনো বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দকে 'ভ্যাম্পায়ার' বলে উল্লেখ করেন। শব্দ সংস্কৃতি, বিলো দি বেল্ট অ্যাটাক ঠিক যেভাবে বামেরা করে তেমনই ভঙ্গি ব্রাত্য বসুর।

আজ প্রশাসন ভাবছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পুলিশ আউট পোস্ট করবে। যখন নিজের রাজ্যের মন্ত্রী আক্রমণের শিকার তখন এটাও একটা প্রশাসনিক নাটক বলে মনে হয়। তাহলে কি মেনে নিচ্ছে রাজ্য সরকার যে তারা যাদবপুরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ ছিল। যাদবপুরকে তার মতো করে লালিত পালিত হতে সম্মতি দিয়েছে প্রশাসন, তাই সেখানে আজাদি শ্লোগান তোলার পাশাপাশি মাদকটাও প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা পায়।

গত বছর স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পর পোস্টার পাওয়া গিয়েছিল DSF, FAS, WTI-এর। এরা কারা? ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন এত গালভরা শব্দ ছেড়ে সোজা কথায় এরাই নকশালপন্থী। এদেরই সিস্টার অর্গানাইজেশন ছিল প্রেসিডেন্সিতে প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস কলেজ অ্যাসোসিয়েশন নামে। এরা কেউ মুখে বলবে না নকশাল, ভদ্র আরবান স্টাইলে বলে বিপ্লবী বাম।

এদের জন্ম সাতের দশক থেকেই। এমন অনেক কুচি কুচি বিপ্লবী সংগঠন যাদবপুরে তৈরি হয়েছে। এরা মুখে স্বাধীন বিপ্লবপন্থী, আদর্শগতভাবে বামপন্থী, কেউ মাও ভক্ত তো কেউ চারু মজুমদারের, আবার কেউ সমালোচকও। কখনে এরা বাবরি ধাঁচা ভাঙার জন্য কেঁদে মরে, কখনো আফজল গুরুর শোকে আকুল হয়। এই নেশন অব থিং কিংটাই সবার কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম আর সেই কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের শক্ত পটভূমি যাদবপুর। আমরা জানি কিন্তু সরকার জানে না?

মহারাষ্ট্র সরকার যে চেষ্টা করতে পারে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পরিচালিত সরকার তা পারে না? মহারাষ্ট্রে স্পেশাল পাবলিক সিকিউরিটি বিল ২০২৪ আরবান নকশাল দমনে আনতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার। বিলটি এখনো পাশ হয়নি। বিতর্ক চলছে। একই ধরনের বিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় আছে। আরবান নকশাল দমন হলেই প্রান্তিক এলাকার নকশাল দমন হয়।

কলকাতার বুকে যাদবপুর আতঙ্ক পুরে পরিণত হয়েছে কারণ এখানে বাম, অতিবাম, বিপ্লবী বাম আর তৃণমূল রাজ্য প্রশাসন সবাই সবাইকে মদত দেয়। যদি যাদবপুরে যথাযথ ছাত্র ঐক্যবদ্ধ শক্তিকেন্দ্র হতো, তবে তারা হোক কলরবেই বিপ্লব ক্ষান্ত করত না। বিপ্লবী, চরিত্র, নেতা, স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির সংস্কারক তৈরি করত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিপ্লব রেকর্ডে দেখাতে পারবে না ওই ক্যাম্পাস থেকে গত কুড়ি বছরে অন্তত দুজন প্রকৃত নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। একদল জীব আছে যার পরাসক্ত হয়ে জন্মায় পরাশক্ত হয়েই মরে। আরবান নকশাল সেই চীনপন্থী পাকিস্তান, ফিলিস্তিন প্রিয় পরাসক্ত প্রজাতি।

যাদবপুর সেই পরাসক্ত প্রজাতির রাজনৈতিক অভ্যাস অনুশীলন করতে আহ্বান করে। মমতার পুলিশ প্রশাসন তাদের ভ্যাকসিন এখনো হতে পারেনি। ■

বঙ্গ নারীশক্তির উদ্যোগে নারীদিবস উদ্‌যাপন

গত ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারীদিবসে 'বঙ্গনারী শক্তি'র আহ্বান ও উদ্যোগে এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় কলকাতার বিধাননগর-স্থিত পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে মহিলা সশক্তিকরণ, নারী স্বাধীনতা, নারীদের আদর্শ, কর্তব্য পালন, কর্মসংস্থান, মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা, আধুনিক সমাজে নারীদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী মহিলারা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গনারী শক্তির উদ্যোগে এই দিন একটি ওয়ার্কশপ (কর্মশালা)-ও আয়োজিত হয়। পুণ্যশ্লোক রানি অহল্যাবাঈ হোলকার দেবীর জন্মের ত্রিশতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং তাঁর জীবনী ছিল এই কর্মশালায় মূল আলোচ্য বিষয়। ইন্দোরের মহারানি পুণ্যশ্লোক উপাধিতে ভূষিতা অহল্যাবাঈ হোলকারের ত্রিশততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং তৎকালীন সমাজ এবং দেশের উন্নতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি কর্মশালায় আলোচিত হয়। তাঁর আদর্শ, তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আজকের প্রজন্মের নারীদের মধ্যে তুলে ধরাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু।

তাঁর জীবনী নিয়ে রচনা লেখা প্রতিযোগিতা, ছোটোদের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, গান, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা, নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি হয়। সবকিছুর পরিবেশনায় ছিল সংস্কার ভারতী, কলকাতা নিবেদিতা শক্তি ও বিবিধ ক্ষেত্রের মহিলা সংগঠন সমন্বয়। সংগঠনগুলির মিলিত প্রচেষ্টায় পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এই কর্মসূচিটি রূপায়িত হয়। আত্মরক্ষার জন্য মার্শাল আর্টে মহিলাদের দক্ষতা অর্জন এবং তাঁদের শারীরিক-মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের উপর এদিন বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর উপরে একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজক বঙ্গনারী শক্তির আহ্বানে এদিন আলোচনাসভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহিলা সমন্বয়ের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজিকা ভাগ্যশ্রী শাঠে, বেদান্ত সোসাইটির পক্ষ থেকে তেজময়ী মা, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রবীণ কার্যকর্ত্রী রীতা চক্রবর্তী, বিজ্ঞানী ড. শম্পা দাস, অধ্যাপিকা ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. দেবযানী ভট্টাচার্য প্রমুখ। ১৯৮৭-'৮৮ থেকে কীভাবে মহিলা সমন্বয়ের কাজ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো এবং আজ বঙ্গ নারীশক্তি কীভাবে কাজ করে চলেছে— সেই বিষয়ে কিছু কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন রীতা চক্রবর্তী। পূজনীয়া তেজময়ী মা, ড. শম্পা দাস রানি অহল্যা-বাঈয়ের জীবনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বাঙ্গলার রানি রাসমণি এবং মা সারদার জীবনের উদাহরণও উপস্থাপন করেন।

মুখ্য বক্তা ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাষ্ট্রবাদী অহল্যা'-শীর্ষক বক্তব্যে রানি অহল্যাবাঈয়ের রাষ্ট্রীয় চেতনার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, দেশের শিক্ষানীতি ও ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে রানি অহল্যা বাঈয়ের নাম সংযোজিত হওয়ার প্রয়োজন। বিশিষ্ট বক্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. দেবযানী ভট্টাচার্য বলেন যে, ভারতের মহিলাদের অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, সেটি কেবল জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্চিতা সরকার। সবশেষে কল্যাণ মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। নন্দিনী রায়, ড. রীতা ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জনা রায়, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, শিবানী চট্টোপাধ্যায়, সঞ্চিতা সরকার এবং বিভিন্ন বিবিধ সংগঠন ও বিভাগের দায়িত্বসম্পন্ন কার্যকর্ত্রী এবং বঙ্গনারী শক্তির কার্যকর্ত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সফলভাবে আয়োজিত হয়।

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১১ মার্চ কলকাতায় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য সরকারের প্রতি 'ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম, ১৯৭৮'-এর বিধি প্রণয়ন ও আইনের ধারাগুলি কার্যকর করার দাবি জানায় অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সভাপতি সত্যেন্দ্র সিংহ ও সহ-সভাপতি তেচি গুবিন বলেন যে, লোভ-লালসা, প্রতারণা ও ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া রোধ করার জন্য অবিলম্বে অরুণাচল প্রদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম, ১৯৭৮-এর ধারাগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার দাবি জানাচ্ছে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।

সত্যেন্দ্র সিংহ এদিন বলেন যে, স্থানীয় স্ব-ধার্মিক জনজাতিদের ধর্মীয় সংস্কৃতি রক্ষা করতে এবং লোভ-লালসা, প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মান্তরণ রোধের লক্ষ্যে তৎকালীন জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭৮ সালে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এই আইনের বিধি বা নিয়মাবলী (রুলস্) এখনও তৈরি না হওয়ার কারণে আইনটি গত ৪৭ বছর ধরে কার্যকরী হয়নি। এই কারণে ২০১১ সালে এই রাজ্যে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেড়ে ৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা এই আইন হওয়ার আগে ছিল মাত্র এক শতাংশ।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর একটি জনস্বার্থ মামলায় অরুণাচল প্রদেশ সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে এই আইনটি কার্যকর করার এবং এর নিয়মাবলী ঘোষণা করার নির্দেশ দেয় গুয়াহাটি হাইকোর্টের ইটানগর বেঞ্চ। সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়টি তুলে ধরে সত্যেন্দ্র সিংহ বলেন যে, এই সময়কাল যত এগিয়ে আসছে, চার্চ এবং চার্চ-দ্বারা প্রভাবিত সংগঠনগুলি আদালতের নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা শুরু করেছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এই ধরনের অশুভ প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার নিন্দা জানায়।

ধর্মান্তরণের গুরুতর পরিণতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সত্যেন্দ্র সিংহ বলেন যে, এই পঞ্চাশ বছরে সনাতনীদের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে ধর্মান্তরণ। অরুণাচল প্রদেশের স্ব-ধার্মিক জনজাতি সম্প্রদায় ধর্মান্তরণের শিকার হয়েছে। পনের লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই রাজ্যে, দুই বিশপ এবং হাজার হাজার চার্চের উস্কানিতে আজ হাইকোর্টের নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ মেনে সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে চার্চ দ্বারা প্রভাবিত এক দল মানুষ। দেশের সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই বিষয়ে নীরব; ধর্মান্তরণের বিষয়ে তাদের চোখ বন্ধ বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে, অরুণাচল প্রদেশের পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারগুলি এই বিষয়টিতে চরম অবহেলা করেছে। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের অবিলম্বে এই আইনের বিধি জারি করা উচিত এবং আইনটিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষে এই দাবিটি উত্থাপন ছাড়াও এই সীমান্তবর্তী, সংবেদনশীল রাজ্যের দেশপ্রেমিক স্ব-ধার্মিক জনজাতিদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে মিডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ জানান।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

আমতলা নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে আলোচনাসভা

গত ১৬ মার্চ কলকাতা-স্থিত আমতলা নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবন সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নৃশংস অত্যাচার ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর দায়িত্ব ও ভূমিকা'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চলমান অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পদ্মশ্রী পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সহ-প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু, 'ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট অ্যাট্রোসিটিজ অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ' বা ক্যাম্বের আহ্বায়ক ড. মোহিত রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, রবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সাওয়ার ধননিয়া এবং হিন্দু জাগরণ সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সমিতির সদস্য সঞ্জয় শাস্ত্রী। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ইউএসএ বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রেসিডেন্ট ড. রাব্বি আলম। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভার শুরুতে সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাওয়া হয়। সভায় তাঁদের বক্তব্যে ড. মোহিত রায় ও ড. জিষ্ণু বসু বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ভারত বিভাজনের পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেহাদি সন্ত্রাস কীভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, আগামীদিনে বাঙ্গালি হিন্দু জাতির জন্য কী দুর্বিষহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও বার্তা তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সুদীপ্ত গুহ ও কেয়া ঘোষ। সভায় বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ড. জিষ্ণু বসু ও ড. মোহিত রায় সম্পাদিত 'আজ বাংলাদেশ, কাল পশ্চিমবঙ্গ' পুস্তকটি উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের উপর সংবাদ পরিবেশন করে সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন তোলা সাংবাদিক অনির্বাণ সিনহা, মানব গুহ, শুদ্ধশীল ঘোষ, স্বপন দাস, রোজিনা রহমানকে উদ্যোক্তাদের তরফে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

সক্ষমের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২ ফেব্রুয়ারি সক্ষম, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলায় অনুষ্ঠিত হলো বিশেষভাবে সক্ষম ভাই-বোনদের নিয়ে একদিনের একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। মাসকালাই বাড়ি বন্ধু সমিতি ক্লাব ও পাঠাগার প্রাঙ্গণে প্রায় ৬০ জন দিব্যাঙ্গ ভাইবোনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন শহরের বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ দুলালচন্দ্র গোপ ও মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ বরুণ বিশ্বাস। জেলার বিভিন্ন নার্সরা তাঁদের এই কাজে সহযোগিতা করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ওষুধ সরবরাহ করে সহযোগিতা করেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সক্ষমের পক্ষ থেকে সারা দিনব্যাপী সুষ্ঠুভাবে ক্যাম্পটি পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় রোটারি ক্লাব, জলপাইগুড়ির সদস্যরাও এই ক্যাম্পটিতে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সক্ষমের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের প্রান্ত সভাপতি তনয় দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ গুহ ও 'সব খান'-এর সম্পাদক রাজেশ আগরওয়াল।

গাজোলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব

গত ৮ ও ৯ মার্চ মালদহ জেলার গাজোল-স্থিত ঘাকশোলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই দু'দিন

ভক্তদের দীক্ষা ও উপদেশ দান করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ। দু'দিনের এই উৎসবে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৯ মার্চ বিকালে আত্মরক্ষামূলক লাঠি, ছোরা খেলা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও এই ক্রীড়ানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফতেপুরের গোবিন্দ সরকার। তারপর শুরু হয় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত গুরু মা কমলী সরেন, সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক গোপাল সাহা, বিধায়ক বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মণ-সহ বিভিন্ন আশ্রম থেকে আগত বিশিষ্ট সাধুসন্তরা। প্রথমে আশীর্বচন দান করেন স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ। তারপর বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান বক্তা অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি বলেন যে, যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের সন্তান। তিনি একজন রুদ্রাবতার, তিনি হিন্দুদের হিন্দু নামেই ডাকতে শিখিয়েছেন। হিন্দুদের হিন্দুত্ব রক্ষা না হলে ভারত আর ভারত থাকবে না। এই কারণে সমাজকে বাঁচাতে হলে চাই হিন্দু সংগঠন। বিভেদ নয়, চাই সামাজিক সাম্য বা সমরসতা। ঘরে ঘরে সন্তানদের হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা প্রয়োজন। পরিবেশ বা পর্যাবরণের সুরক্ষা, আত্মরক্ষার প্রয়াস, সদ্‌ভাবনা, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, জৈব কৃষির বিস্তারের মতো বহু বিষয় তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন সম্মেলনের প্রধান বক্তা অদ্বৈতচরণ দত্ত। অন্যান্য বক্তারাও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় মঙ্গলারতি ও বিশাল শান্তিযজ্ঞ হয়।

এই সম্মেলনটি আয়োজনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক উৎসব ও সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

দ্বারহাট্টায় সরস্বতী শিশুমন্দিরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১১৯তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ইসিজি করিয়েছেন ২৩ জন, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার ও ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করিয়েছেন ২৬ জন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন ৫৭ জন। এইদিন

শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। মহারাজের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন আঁটপুর রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্য স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও শিশুমন্দিরের দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মই করে মনুষ্য জীবনে পূর্ণত্ব প্রদান

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ধর্মই হলো সনাতন ভারতবর্ষের আন্তর্জাগতিক চালিকা শক্তি। তার চিন্তা, ভাবনা, মনন, রাষ্ট্রগঠন বা তার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সব কিছুরই যা মূল— তা হলো ধর্ম।

'ধর্ম' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'রিলিজিয়ন' কিন্তু কোনো আদপেই সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির কোনো সার্থক প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে না। এই শব্দ সনাতন বৈদিক ঋষিদের এক একান্ত উদ্ভাবন, যাকে বলা যায়— 'একমেব-অদ্বিতীয়ম্'।

ধৃ-ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' শব্দটি সিদ্ধ হয়। 'ধৃ'-অর্থে ধারণ করা আর মন অর্থে যা সদা গতিশীল বা মননশীল অর্থাৎ যাকে ধারণ করলে জীবন হয় গতিশীল, যা এগিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণতার দিকে তাই হলো ধর্ম। কারণ, গতিশীলতাই দিতে পারে পূর্ণতা। তাই, ধর্ম কোনো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নয়। সুতরাং রিলিজিয়ন শব্দটি ধর্ম— শব্দের সমার্থক নয়।

ধর্ম পূর্ণতা প্রদান করে। ধর্ম শান্তি প্রদায়িনী। তাই শুক্ল যর্জুবেদীয় ঋষি মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
—শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় (৫/১/১)

'ওঁ'-এর অর্থ অ-উ-ম অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। অখণ্ড ব্রহ্মের প্রতীক। পূর্ণমদঃ এবং পূর্ণমিদং অর্থে উহা পূর্ণ ও ইহা পূর্ণ। পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণই সৃষ্ট হয় বা তার আবির্ভাব

ঘটে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে অর্থে পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করলে পূর্ণই থাকে। সত্য থেকে যেমন শুধু সত্যই আসে, কখনই অসত্য আসতে পারে না তেমনই পূর্ণ থেকে শুধুমাত্র পূর্ণই আসে। আর ধর্মই আনে সেই পূর্ণতা। এনে দেয় শাশ্বত শান্তি।

যা নিত্য, যা অবিনশ্বর, যা চিরন্তন, চিরকালীন তাই হলো ধর্ম যা সনাতন। জীব ধর্মাশ্রয়ী হয় পূর্ণতার জন্য তাই ধর্মও জীবাশ্রয়ী। আর পূর্ণতা মানেই শান্তি। শুধু জীব নয়, বিশ্বচরাচর, পঞ্চতত্ত্ব, সূর্য, চন্দ্র, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, নীহারিকাপুঞ্জ— ধর্ম সবকিছুকেই ধারণ করে রয়েছে। তাই, প্রত্যেকেরই নিজস্ব নিয়ম আছে ও স্বধর্ম আছে। এটাই সনাতন। যেমন, মানবধর্ম সনাতন।

আসলে ধর্মের মূলে রয়েছে শ্রদ্ধা। আর, এই মূলের উৎকর্ষতা সাধনের জন্যই তীর্থ। এই শ্রদ্ধাই সনাতনী হিন্দু-জনতার প্রাণশিখা। যে শ্রদ্ধার বীজ কোটি কোটি হিন্দুর মনে বর্তমান, তাকেই কেন্দ্র করে তীর্থের মাধ্যমে সনাতনী হিন্দু উদ্‌যাপন করে তার ধর্ম যা মানবতাকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায় তার অলক্ষ্যে।

ভারতবর্ষের তীর্থগুলিতে দেখা যায় এই শ্রদ্ধারই দীপ্ত প্রকাশ। নিজের সংস্কৃতি, নিজের অতীত নিজের সংস্কার, পূর্বপুরুষের গৌরবমণ্ডিত উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে মানুষ। মনন করে ভাবলোকে। নিজেকে খুঁজে পায় একান্ত নিজ-স্বভাবে। একমাত্র তীর্থস্থান ছাড়া এমন মানসলোক অন্য কোনো মাধ্যমই উন্মোচন করে না।

যদিও, এই তীর্থ পরিক্রমা সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ করে পাশ্চাত্য ভাবধারার কট্টর প্রচারক কিছু মানুষ ভাবেন যে, সনাতনী ভাবধারায় স্থাপিত তীর্থগুলি শুধুমাত্র পুণ্য অর্জন ও পাপ স্খালনের স্থান। তারা মনে করেন যে সনাতনী হিন্দুরা বুঝি পাপস্খালন করতেই তীর্থভ্রমণ বা তীর্থস্থান দর্শন করেন তাঁরা বলে থাকেন হাজার পাপ করে তীর্থদর্শন করলেই কি পাপ স্খালন হয় বা পুণ্যার্জন করা যায়? যেসব মানুষ পাপ স্খালন করতে বা পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থযাত্রা

করেন, প্রকৃতপক্ষে সেটি তাঁদের বা সেটি সেই ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাস মাত্র। তার জন্য তীর্থ মোটেই দায়ী নয়। তবুও, যে শ্রদ্ধা থেকে তাঁদের এই বিশ্বাসের উন্মেষ, তা নিশ্চয় কখনোই ফেলনা হতে পারে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি তীর্থের ভাবাদর্শগ্রাহী হন, অহেতুক ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা তীর্থভ্রমণ করেন না। সনাতনী মুনি-ঋষিগণ এক একটি নির্দিষ্ট স্থানকে তীর্থ হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন স্থানটির মহত্তম ভাবাদর্শকে আশ্রয় করেই। তাঁরা জানতেন এইগুলি অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রগুলিতে এমন কিছু মহাজাগতিক চিদ্‌কণার স্রোত চিরবহমান যে তা মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বর্ধিত করতে সাহায্য করতে পারে। সেজন্যই মহিমা বর্ণনার ছলে তাঁরা শ্রদ্ধার বীজটি এমনভাবে বুনে দিয়ে গেছেন যে তীর্থযাত্রাকালে এক সময় শ্রেয়র প্রতি মানুষ টান অনুভব করে। আর এই টান একটু একটু করে তাকে মানবধর্মের স্রোতস্বিনী ধারায় ভাসিয়ে পূর্ণতার মোহনায় পৌঁছে দেয়। কারণ মানব কল্যাণ সাধনই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁরা জানতেন, এই মুক্তি বা পূর্ণতার মোহনায় ঠিক কতজন অবগাহন করতে পারবে! কতজনের মুক্তি বা মোক্ষলাভ হবে তারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট হিসাব রেখে গেছেন। 'চারণিক'-কৃত 'ওই মহামানব আসে' গ্রন্থে আজকের যুগঋষি শ্রীভগবানজী বা মহাকাল (যাঁকে ভারতের আপামর রাষ্ট্রবাদী, দেশপ্রেমী মানুষ বিশ্বাস করেন নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু বলে।) বলেছেন,
'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
— 'ইটের ছাঁচে সাধারণ মানুষ নিজেকে গড়তে পারে না। প্রতি আড়াই লাখে একজন মাত্র পারে। এটা সেট ক্যালকুলেশন-এর নড়চড় হবে না।' তার মানে, প্রতি আড়াই লক্ষ কর্মীর মধ্যে একজন মাত্র কর্মযোগী হন এবং মুক্তিলাভ করেন। তাহলে বাকিরা কী করবেন? তীর্থস্থানগুলি ঋষিরা এজন্যই স্থাপন করেছিলেন, যাতে একটু একটু করে সবাই মূলস্রোতে একদিন মিশে যেতে পারে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে সপ্তমোঽধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ-এর ৩নং শ্লোকে বিবৃত করেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়েঃ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

সহস্র হলো একটা একক যা নির্দিষ্ট। শৈবতন্ত্রানুসারে বন্ধন বা পাশযুক্ত জীব হলো পশু আর পাশমুক্ত জীব হলো শিব বা, কিঞ্চিৎ পাশমুক্ত জীব মনুষ্য পদবাচ্য। এর ব্যাখ্যায় শ্রীভগবান এবং অন্যান্য মহাপুরুষরা বলেছেন— এই বিশ্বে সহস্র পশুর মধ্যে যারা মনুষ্য তারা ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। যারা মনুষ্য নামধারী পশু তারা ভগবানে বিশ্বাসী নয়। সহস্র মনুষ্য নামধারী মনুষ্যের মধ্যে যারা ভগবানে বিশ্বাসী তারা বিশ্বাসটি ক্রিয়ায় পরিণত করতে সাধনায় নামে। হাজার সাধনকারীর মধ্যে একজন লাভ করে সিদ্ধি। তার মুক্তিলাভ ঘটে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে। এই হাজার সিদ্ধপুরুষের মধ্যে একজন জানতে পারে প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্ব। যা নানাবিধ উপাদান সমন্বিত তত্ত্ব বা পঞ্চতত্ত্বের সমাহার হতে পারে।

তাই তীর্থে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পাপ স্খলন হয় না কিন্তু মহাপাষণ্ডও তীর্থের মহিমায় হয় শ্রদ্ধাপ্লুত। সেই শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধেয় বস্তু, সেই স্থান মাহাত্ম্য মহাপাষণ্ড ব্যক্তির মনেও এনে থাকে চিত্তের সম্প্রসাদ। এটাই পুণ্য সঞ্চয়। কারণ, এই শ্রেয়র প্রতি টানই তাকে একটু একটু করে এগিয়ে দেবে পূর্ণতার দিকে। শান্তির পথে। জন্মজন্মান্তরে এই সংস্কার তাকে মুক্ত করে দেবে। একদিন না একদিন সে ঠিক পৌঁছে যাবে পূর্ণতার মোহনায়।

□

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

দীপক খাঁ

বহু বিপ্লবীর আত্মবলিদান ও সমাজ সংস্কারকদের আত্মত্যাগের ফলে আমরা পেয়েছি এই গৌরবময় ভারতবর্ষ। সময়ে সময়ে মহাগুরুরা আবির্ভূত হয়ে তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে সমস্ত সংকট থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করেছেন। তাঁদের দেখানো পথ ও প্রেরণাকে পাথেয় করেই আজও ভারতবর্ষ সমস্ত রকমের বাদা বিপত্তিকে অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। দেশপ্রেমে পাগল, পত্নীপ্রেমে পাগল, ব্রিটিশ অত্যাচারে পাগল, দুর্বার প্রাণশক্তিতে পাগল, প্রলয় নাচ নাচা পাগলা ভোলার চেলা আশ্চর্য এক মানুষ ছিলেন উল্লাসকর দত্ত।

শিবপুর বোটনিকাল গার্ডেনের কাছে বসবাস করা, পিতা দ্বিজদাস দত্তের পুত্র উল্লাসকর পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে। নেতাজী এই কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন প্রফেসর ওটেন সাহেবকে প্রহারের অভিযোগে। আর উল্লাসকর বিতাড়িত হন একই ধরনের আপরাধে।

এরপর বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে শিবপুরের বাড়িতে তিনি গোপনে একটি ল্যাবরেটরি করে বোমা নির্মাণ শুরু করেন। তাঁরই নির্মিত বোমা চন্দননগরের মেয়রের বাড়িতে ছোঁড়া হয়। নারায়ণগড়ের ছোটোলাটের গাড়ি ওড়াতে ব্যবহৃত হয় তারই তৈরি বোমা। তিনি এমন শক্তিশালী পাকসন পাউডার আবিষ্কার করেছিলেন, যা বাতাসের সামান্য সংঘর্ষে বিস্ফোরণ ঘটাতো। বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ফোরণে একবার তিনি নিজেও গুরুতর আহত হন। সেবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসেন তিনি।

মুরারীপুকুর কেন্দ্রে পুলিশ যখন হানা দেয় তখন বোমাগুলি তিনি একটি ঔষাধালয়ে রেখে আসেন। কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তিনি নির্বাসনে যান। আন্দামানে ইংরেজ পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। নির্বাসনের শেষে অন্য বিপ্লবীদের মুক্তি দেওয়া হলেও সরকার তাকে ছাড়তে চায়নি। শেষে অন্য বিপ্লবীদের মুক্তি দেওয়া হলেও সরকার তাকে ছাড়তে চায়নি। শেষে স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় তিনি মুক্তি পান এবং কিছুদিন কুমিল্লায় অন্তরীণ থাকেন। তাঁর জীবন চরিত যেন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিপ্লবী উল্লাসকরের মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে হাস্যপরিহাস, রঙ্গরসিকতার কাহিনি সর্বজন বিদিত। মৃত্যুকে বন্ধুর মতো হেসে তিনি বারবার অভ্যর্থনা করছেন। আলিপুর বোমার মামলার রায় বের হওয়ার দিন সারা দেশ যখন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে প্রতীক্ষা করছে, বিপ্লবীদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের রাতের ঘুম চলে গেছে, কী আছে বন্দিদের কপালে? কারাবাস? দ্বীপান্তর? নাকি ফাঁসি? যাদের ভাগ্য সম্পর্কে তাদের এই অধীর আগ্রহ তখন তারা কিন্তু নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সহবন্দির সঙ্গে তিনি আলোচনায় ব্যস্ত যে, কোর্ট ইন্সপেক্টরের ভুঁড়িটা ঠিক কত ফুট, কত ইঞ্চি হতে পারে।

মামলার রায় বেরোয়, অপরাধে উল্লাসকরের সাত বছরের কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড। বিচারকের রায় শুনে হো হো করে হেসে উঠে সরকার পক্ষের উকিলকে বললেন, 'সাত বছরের জেল ফাঁকি দিলাম। অনেক বিচারের ধারায় আমায় বাধার চেষ্টা করেছিল। সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলো তো। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লে আর জেলে পুরবে কাকে?' এমনই পরিহাসপ্রিয় ছিলেন উল্লাসকর দত্ত।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদেধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ আপিল করেন হাইকোর্টে। আপিলের রায় যেদিন বের হয় সেদিন উল্লাসকর মুখরিত করে দেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি গেয়ে। প্রধান বিচারপতির এজলাসে এটা আইনবিরুদ্ধ হলেও সেখানে মাতৃভূমির বন্দনা সংগীতরত নির্বাসন যাত্রী বিপ্লবী গায়ককে থামিয়ে দিতে কারোর প্রাণ চায়নি। যে গান শুনে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের চোখে অশ্রুধারা বয়ে যায়। ১৭ মে ১৯৬৫ শিলচরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উল্লাসকর দত্ত। অজস্র মৃত্যুকে পার করে আসা মৃত্যুর সঙ্গে করমর্দন করা মানুষ সেদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন সেদিনও শয্যাপাশে শোকাচ্ছন্ন শুভানুধ্যায়ীদের শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা ভিড় করেছো কেন? আমার কী হয়েছে? আমায় ঘুমোতে দাও।'

রণক্লান্ত বিপ্লবীর কাছে মৃত্যু মানে বিশ্বাস। তীক্ষ্ণ মেধা, দুরন্ত জ্ঞান, দুরন্ত সাহস, নিবিড় প্রেম এসবের অপূর্ব মিলন হয়েছিল বঙ্গভূমি রক্তরাঙা যুগের এই বিপ্লবীর মাঝে। অগ্নিযুগের আশ্চর্য মানুষ এই উল্লাসকর দত্ত। □

নাট্যশাস্ত্রের অঙ্গনে শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য

বৈশাখী কুণ্ডু

শাস্ত্রীয় নৃত্য গভীরভাবে নাট্যশাস্ত্র অনুসারী। সময় ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজকে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি দেখা যায় নাট্যশাস্ত্রে সেই নামগুলির উল্লেখ নেই। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে চারটি প্রবৃত্তি বা নাট্যধারার উল্লেখ রয়েছে। যথা— অবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। এই চারটি প্রবৃত্তিধারা ভারতবর্ষের চারটি দিকে অবস্থান করছে। উত্তরে অবন্তী, দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যা, পশ্চিমে পাঞ্চালী এবং পূর্বে ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি বা নৃত্যধারা প্রচলিত। অবন্তী ও পাঞ্চালী নৃত্যধারা সম্পর্কে কিছু তথ্য অজ্ঞাত। দাক্ষিণাত্যা ও ঔড্রমাগধী নৃত্যধারা থেকে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি হলো ভরত নাট্যম, কুচিপুড়ি, কথাকলি ও মোহিনীআট্টম। পূর্ব ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি হলো গৌড়ীয়, মণিপুরী, ওড়িশি, সত্রিয়। দেখা যাচ্ছে, ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির উৎস হলো নাট্যশাস্ত্র। তথাপি প্রত্যেকটি নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

ভরতমুনির মতে, প্রবৃত্তি হলো নানা দেশের নানা ভাষা, নানা আচরণ ও নানা বেশভূষা। এই কারণে নৃত্যগুলির উৎসস্থল এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি পৃথক সত্তাযুক্ত। প্রত্যেকটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের আধার হলো সেই দেশের লোকনৃত্য। উদাহরণ স্বরূপ—

ভগবত মেলা নাটক, কুচিপুড়ি গ্রামীণ নাট্য, কুরুভাঞ্জি ও সাদির থেকে ভরতনাট্যম সৃষ্টি হয়েছে। সেরাইকেল্লা ছৌ, গোটিপুও, মাহারি নৃত্য থেকে ওড়িশি এবং নাচনী, ছৌ, কীর্তন থেকে গৌড়ীয় নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বলা যেতে পারে, একই মায়ের পাঁচ সন্তানের মতো। উৎস একই হলেও প্রত্যেকেই নিজস্বতা বহন করে চলেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই নাট্য অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। নাট্যগুলি পৌরাণিক পালা নির্ভর এবং নৃত্যগীত ও নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এই নাট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলিতে নৃত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাট্যে অংশগ্রহণকারী নৃত্যশিল্পীরা একক, যুগ্ম ও সমবেত হয়ে থাকে। অনেক নাট্যতে যে হাস্যরসের চরিত্র থাকে, শাস্ত্রমতে বিদূষক বলে। অঞ্চলভেদে তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোনো কোনো নাট্যে মূল বা গুরু নিজে নাচেন, আবার কোথাও আলাদা নৃত্যশিল্পী থাকেন। নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানে মুখ্যগায়েন, সমগায়েন ও মার্দঙ্গিক দেখা যায়, তা বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যে দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গ বিধান অনুযায়ী অনেক গ্রামীণ নাটকের সূত্রপাত হয়। যেমন আরম্ভ ও আশ্রাবনা দিয়ে শুরু হয়, তারপর বক্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘটনা ও মার্গাসারিত। তারপর পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি। বিভিন্ন লোকনাট্যগুলির ওপর ভিত্তি করে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভিত গড়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশাস্ত্রের কাছে লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্য উভয়ই ঋণী।

(লেখিকা গৌড়ীয় নৃত্যসাধিকা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনের অন্ধকার দিকগুলি ঠিক কি রকম

দেবজিৎ সরকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার রক্ষায় ও মানসিক উন্নয়নের জন্য প্রথম থেকেই সেখানে বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি এবং ছাত্র ইউনিয়ন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে FETSU, AFSU এবং SFSU-এর মতো অনুষদ-নির্দিষ্ট ইউনিয়ন, যারা অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির আরও বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হলো :

ছাত্র ইউনিয়ন :

বিভাগনির্দিষ্ট ইউনিয়ন :

FETSU (ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) : ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

AFSU (কলা বিভাগের ছাত্র ইউনিয়ন) : কলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

SFSU (বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ইউনিয়ন) : বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

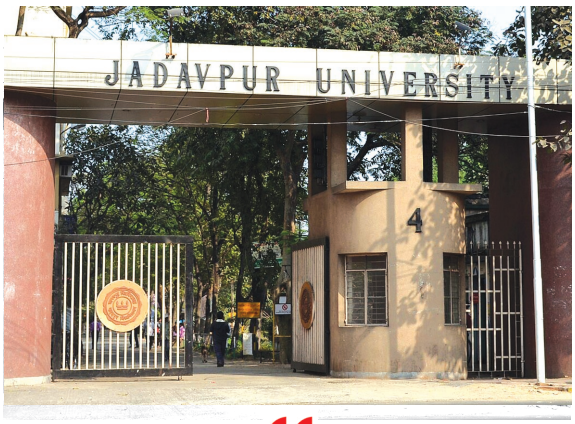

> “যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সারা দেশের সেরা মেধাকে খুব অল্প ফিজে পড়ানো হয়। কিন্তু দেশবিরোধী উগ্র মাও ও নকশালবাদীদের দ্বারা দেশের সেরা মেধা গণতন্ত্রবিরোধী দেশবিরোধী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।”

গঠন :

এই ইউনিয়নগুলি নির্বাচিত ছাত্র সংগঠন যার সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকের মতো পদাধিকারী, পাশাপাশি শ্রেণী ও জার্নাল প্রতিনিধিরাও থাকেন।

কার্যক্রম :

তারা অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করে।

প্রতিনিধিত্ব :

ছাত্র ইউনিয়ন এবং হোস্টেল বোর্ডারদের ছাত্র কল্যাণ বোর্ড, স্বাস্থ্য বোর্ড ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

ক্লাব এবং সমিতি :

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্বতারোহণ ও হাইকিং ক্লাব (স্থাপিত ১৯৬৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফিক ক্লাব, কুইজ ফোরাম এবং বিতর্ক সমিতি (QFDS), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প ও সাহিত্য সমিতি, অন্যান্য ক্লাব : দাবা ক্লাব, সংগীত ক্লাব, নৃত্য ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি।

সক্রিয় ক্লাব : পর্বতারোহণ, হাইকিং ক্লাব এবং ফোটোগ্রাফিক ক্লাব তাদের কার্যকলাপের জন্য পরিচিত।

জেইউপিসি : যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ফোটোগ্রাফিক ক্লাব।

অন্যান্য ছাত্র-সম্পর্কিত কার্যকলাপ :

প্লেসমেন্ট অফিস :

শিক্ষার্থীদের চাকরির সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করে, কর্মশালা পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থী এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে।

ইনোভেশন কাউন্সিল (IIC) :

উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহিত করে, কর্মশালা আয়োজন করে এবং শিল্প পরিদর্শনের সুবিধা প্রদান করে।

ক্রীড়া বোর্ড :

খেলাধুলায় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র :

ওষুধ, পরীক্ষা এবং হাসপাতালে ভর্তির জন্য বিনামূল্যে পরামর্শ এবং নামমাত্র চার্জ প্রদান করে।

আর্থিক সহায়তা :

এনডাউমেন্ট স্কলারশিপ, বই অনুদান এবং একটি ছাত্র সহায়তা তহবিল অফার করে। কিন্তু ষাটের দশক থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই

ফ ঃ ৫

বিশ্ববিদ্যালয় অতিবামপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীগুলোর অত্যাচার ও ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর অত্যাচার, তাদের ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির উত্থান :

তখন ১৯৭০ সাল শেষ হতে চলেছে। চীনের দালালদের মাধ্যমে ভারতের উপর দিয়ে ইতিমধ্যেই 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' বেজে গেছে। মাও সেতুং-এর পথনির্দেশিত কৃষি বিপ্লবের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) জন্ম নিয়েছে ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল। ১৯৭০ সালের মার্চ মাস থেকে কলকাতায় শহুরে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। ১৯৭০ সালের ২ মার্চ, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা অধ্যক্ষের কক্ষ লুঠপাট করে এবং দেওয়ালে স্লোগান ও মাওয়ের স্টেনসিল করা প্রতিকৃতি দিয়ে সাজায়। তারা একই দিনে কাছাকাছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৬ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটায়। ২৪ মার্চ, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের উপাচার্যের অফিস লুঠপাট করা হয় এবং দেওয়ালে 'সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগজের বাঘ', 'এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে যত পড়বেন, ততই বোকা হবেন', 'পচা ইয়াঙ্কি সংস্কৃতির পতন হোক' ইত্যাদি স্লোগান লেখা হয়। ১০ এপ্রিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গান্ধী ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অডিটোরিয়াম আক্রমণ করে, গান্ধীজীর একটি জীবন-আকারের প্রতিকৃতি টেনে নামিয়ে ধ্বংস করে, তার লেখা এবং তার সম্পর্কে লেখা প্রচুর বই পুড়িয়ে দেয় যা লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর হেমচন্দ্র গুহ নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেন। তার স্থলে কলা বিভাগের ডিন প্রফেসর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন। পরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. গোপালচন্দ্র সেনকে ১৯৭০ সালের ৭ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর উত্থান ঘটেছে মূলত ১৯৭০-এর দশকে, যখন মাওবাদী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সময় থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন অতিবামপন্থী গোষ্ঠী তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এদের মধ্যে স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI), ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (DSO) এবং ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অন্যান্য মাওপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি উল্লেখযোগ্য।

এই গোষ্ঠীগুলো তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তারা প্রায়ই অস্ত্র ব্যবহার করে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত থাকে। এই গোষ্ঠীগুলোর কার্যকলাপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

ঠিক কেমন ছিল সেই দিনগুলো?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরের পরিস্থিতি ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ— প্রধানত সিপিআই(এম)-এর ছাত্র ফেডারেশন এবং মাওপন্থীদের মধ্যে— যার ফলে ক্লাস স্থগিত করা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এটি ছিল হাতের তৈরি বোমা (যা 'পেটো' নামে পরিচিত) ব্যবহার করে উভয় পক্ষের তীব্র যুদ্ধের সময়। জেইউ-তে ইতিহাস পড়াতেন প্রফেসর উমা দাশগুপ্ত, তিনি লিখেছেন : 'সত্যিই, জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ত যখন আমরা ক্লাসে বসে শিখছিলাম এবং অন্যরা ছাদ থেকে বোমা ছুঁড়ছিল। বোমাগুলো আমাদের দিকে ছোঁড়া হয়নি, আমাদের বিশ্বাস ছিল কিন্তু তাদের বিরোধীদের দিকে ('স্মতিচারণ', পুনর্মিলন ইতিহাস বিভাগ ১৯৭৮ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্মারক)।

এদিকে ১৯৭০ সালের ২৯ এপ্রিল, ক্যাম্পাসের ভিতরে একজন সিপিআই(এম) কর্মীদের আক্রমণের শিকার হন। বিশ্ববিদ্যালয় ৩০ এপ্রিল ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। সেই রাতেই, ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র এবং নকশালপন্থী আদর্শের সমর্থক মানিক দাস মহাপাত্রকে এসটিপি হোস্টেলের ডাইনিং হলে সিপিআই(এম)- সমর্থিত গুন্ডাদের দ্বারা হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী ছিল? রেজিস্ট্রারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মন্তব্য করেন যে এটি দলীয় সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই বরাবরের দায়সারা মনোবৃত্তি ও একশ্রেণীর বাম মানসিকতার অধ্যাপকদের দোষী বামপন্থী ছাত্রদের আড়াল করার মানসিকতা— বারবার অন্যায়কারী ছাত্রদের আরও অন্যায় করতে উৎসাহিত করেছে।

বাম ও অতিবাম রক্তলোলুপতা :

তারিখটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭০। অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন সন্ধ্যায় একা বাড়ি ফিরছিলেন, রেজিস্ট্রারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার পর ক্যাম্পাস ধরে। পরের দিন তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পুনরায় যোগ দেবেন। তিনি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি পেরিয়ে যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেদিকে এগোলে, হঠাৎ পাঁচজন লোহার রড ও ছুরি নিয়ে তার উপর হামলা করে এবং তার মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে ও পেটে ছুরি মারে। তিনি তাঁর বাড়ি থেকে ২০ গজের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান। আক্রমণকারীরা ঝিল এবং ফ্যাকাল্টি ক্লাব গেস্ট হাউসের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাউন্ডারি প্রাচীর টপকে পালিয় যায়। ঘটনার সময় ছিল সন্ধ্যা ৬.৩০। দারোয়ানের চিৎকারে কাছাকাছি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলা করা কিছু ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁকে প্রথমে তাঁর বাড়িতে এবং তারপর রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে একটি ট্যাক্সিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

২৪-পরগনা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, যার মধ্যে মি. রথীন সেনগুপ্ত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ অশোক চক্রবর্তী, সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, মিঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, ডিআইজি, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। একটি পুলিশ কুকুরকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, আক্রমণকারীরা নকশালপন্থী (তথ্যসূত্র: 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ছুরিকাঘাতে নিহত ক্যাম্পাস ঘটনা : পুলিশ আক্রমণকারীদের সন্ধানে' দ্য স্টেটসম্যান, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০ : 'যাদবপুর ভিসি ছুরিকাঘাতে নিহত', হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০; 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ছুরিকাঘাতে নিহত, আক্রমণকারীরা পলাতক : ক্যাম্পাস ট্র্যাজেডি': নিজস্ব প্রতিনিধি, অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০)। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁরা বুঝতে পারেননি কেন অধ্যাপক সেনের মতো একজন জনপ্রিয় শিক্ষককে আক্রমণ করা হয়েছে। তার কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না (দ্য স্টেটসম্যান)। একজন ছাত্র হাসপাতালের গেটে একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন যে, মিঃ সেন খুব স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি একদিন বলেছিলেন যে তিনি ছাত্রদের হাতে মরবেন না (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)। এই ভয়াবহ

হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় সোচ্চার হন বহু মানুষ ও সংগঠন। ৩১ ডিসেম্বর অধ্যাপক সেনের মরদেহ মোমিনপুর মর্গ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখান থেকে বহু মাইল দীর্ঘ শোকযাত্রা দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা ধরে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অধ্যাপক গোপাল সেনের আক্রমণকারীরা ব্র্যান্ডেড অপরাধী এবং কিছু লোক দ্বারা তাদের এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল ('মিটিং মোর্নস্ ডেথ অফ প্রফেসর গোপাল সেন': হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২ জানুয়ারি, ১৯৭১)। ড. ত্রিগুণা সেন মন্তব্য করেন যে, যারা তাঁর হত্যা করেছিল তারা কখনই ছাত্র হতে পারে না ('প্রফেসর সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক': অমৃতবাজার পত্রিকা, ২ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

১ জানুয়ারি সকালে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে একজন— রাণা বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র; অন্যজন হলো— প্রভাত বারিক, একজন গাড়ি চালক।

প্রশ্ন হলো কে এই রাণা বসু?

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকার সেই বছরগুলিতে রাণা বসু নকশালপন্থী বন্দিদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের দ্বারা জেলের অভ্যন্তরে সব কার্যকলাপে (নকশালপন্থীদের ভাষায়— 'সমস্ত সংগ্রামে') সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। বেলঘরিয়ার বাসিন্দা এবং সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন নকশালপন্থী বন্দি স্বপন গুহ (মাস্টার) পরে জেলের মধ্যে তার ইতিবাচক ভূমিকার কথা তুলেও ধরে।

রাণা বসুর বিরুদ্ধে প্রায় ৩০টি অভিযোগ ছিল যার মধ্যে অধ্যাপক গোপাল সেনের হত্যাও ছিল। বলা বাহুল্য যে, বাম ইকোসিস্টেমের বদান্যতায় অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির দিন জেলের প্রধান গেট থেকে বের হওয়ার পর তাকে আবার হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সম্ভবত সিপিআই-এর সাংসদ ভূপেশ গুপ্তর হস্তক্ষেপে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভূপেশ গুপ্ত রাণার পিতা-মাতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাণাকে একটি শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় যে তাকে এক বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবাম— দুই গোষ্ঠীই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে শিক্ষাঙ্গন অস্থির করে তুলেছে।

রাণা বসুর একটি নতুন পরিচয় এবং বাড়ি থেকে দূরে কোথাও আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। জামশেদপুরের একজন আত্মীয়ের বাড়িতে সে আশ্রয় নেয়। এক বছর পরে অধ্যাপক গোপাল সেনের হত্যাকারী রাণা বসু কলকাতায় ফিরে আসে। ট্রাম কর্মীদের সংগঠন পুনর্গঠনের প্রয়াসের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসন লাভের চেষ্টাও করে সে। কিন্তু কর্মীরা তাকে বলেছিলেন যে, তাকে মেনে নিলেও, তাঁরা ফের কোনো সমস্যায় পড়তে চান না। তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে রাণা। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাকে পুনরায় ভর্তি নিতে অস্বীকার করেন। একজন ব্যক্তি, যাকে উপাচার্য হত্যার অভিযোগ থেকে সদ্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাকে কী করে আবার ছাত্র হিসেবে ভর্তি করা যেতে পারে? রাণা তখন আইআইটি, দিল্লি এবং আইআইটি, মুম্বইয়ের মতো অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতে চেষ্টা করে। এর জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার একটি ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পিসিভি মালিক, তৎকালীন নিয়ন্ত্রক তা দিতে অস্বীকার করেন।

রাণা বসুর বোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। তিনি সেন্ট সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ে রাণার ভর্তির ব্যবস্থা করেন। আমেরিকায় গেলেও মাও প্রদর্শিত 'বিপ্লবে' তার বিশ্বাস অটুট ও অপরিবর্তিত ছিল। হরিপ্রসাদ শর্মা ও অন্যান্যদের সঙ্গে রাণা বসু ইন্ডিয়ান পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (আইপিএএনএ হলো বিদেশের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মাওবাদ সমর্থনকারী সংস্থা)-নামক সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে রাণা বসু কানাডায় মন্ট্রিয়লের স্থায়ী বাসিন্দা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র রাণা বসু নকশালবাড়ি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তার পিতা ডাঃ অমিয় বসু তখন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কার্ডিওলজিস্ট ছিলেন। যুগান্তর সমিতির প্রাক্তন সদস্য অমিয়বাবু ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের ঘনিষ্ঠ। রাণা বসুর মা চামেলি বসু, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে গণিতে বিএসসি ডিগ্রি অর্জনকারী বিশ্বের প্রথম মহিলা ছিলেন— যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমএসসি-র সমতুল্য ছিল। তিনি প্রফেসর আরএভি ফিশার এবং আরডব্লু ডেমিং-এর অধীনে গবেষণা করেছিলেন। গবেষণা শেষ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বেকার ল্যাবরেটরিতে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন এবং ডাঃ অমিয় বসু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

সেই বাম ও অতিবামপন্থী অরাজকতার দিনগুলিতে, মাওবাদের নামে বাঙ্গালি মেধাহত্যাকারী চক্রান্তের ফসল হিসেবে বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে অনেক শিক্ষিত তরুণ-তরুণী তথাকথিত বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। রাণা বসু তিলজলা বস্তি এলাকায় ট্রাম কর্মীদের মধ্যে সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করে।

১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর অধ্যাপক গোপাল সেনের হত্যার পর কলকাতা পুলিশ প্রথমে অভিজিৎ দাসের বাড়ি তল্লাশি করে। সে তখন বাড়ি ছিল না। তারপর তারা রাণা বসুর বাড়িতে যায় এবং তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। যদি তারা অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করতে পারত, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকেও উপাচার্যের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো। রাণা বসুর গ্রেপ্তারির পর, পুলিশের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, রাণা অবশ্যই এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। পরবর্তী ঘটনাগুলি সকলেরই জানা। প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য রাণার আত্মীয়-স্বজনের উচ্চ সামাজিক অবস্থান এবং তাদের উচ্চস্তরের যোগাযোগের কারণে তার মুক্তি, পড়াশোনা শেষ করার জন্য তার বিদেশ যাওয়া এবং পরবর্তীকালে বিদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস--- পুলিশের মনে একদা জন্মানো

বিশ্বাসটিকেই বাঙ্গালি মননে দৃঢ় করে। তৎকালীন সিপিআই নেতা ও সাংসদ ভূপেশ গুপ্তর সহযোগিতায়, বাম ইকোসিস্টেমের দৌলতে দেশত্যাগ করে বিদেশে বিলাসবহুল জীবন যাপন এবং বিদেশে থেকেই তার কার্যকলাপ অব্যাহত রেখে দেশের মাটিতে একের পর এক প্রজন্মকে ভারতবিরোধী মানসিকতায় আচ্ছন্ন করে তোলে রাণা বসু।

সাম্প্রতিক অতীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবাম ছাত্রদের অত্যাচার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 'ছাত্র সংগঠন' নামধারী বাম ও অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির অত্যাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালায়। প্রায়শই তারা বিরোধী মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা করে এবং তাদের ভীতি প্রদর্শন করে।

২০১৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ঘটনা ঘটে, যেখানে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন ছাত্রকে ব্যাপক মারধর করে। এই ঘটনায় আলোড়িত হয় গোটা দেশ। এই ঘটনা প্রায়ই সেখানে ঘটে থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই বিষয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সদা বিরত থাকে। অতিবাম গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তারা প্রায়ই ছাত্র ধর্মঘট ডাকে এবং ক্লাস বন্ধ করে দেয়। এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে ছাত্রদের পড়াশোনা ব্যাহত হয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ভারত-বিরোধী জেহাদ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির ভারত-বিরোধী কার্যকলাপও নতুন কিছু নয়। এই গোষ্ঠীগুলি প্রায়ই ভারতের সংবিধান ও জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মানসূচক মন্তব্য করে এবং ভারত বিরোধী স্লোগান তোলে। তারা ভারতের সেনাবাহিনী ও রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধেও স্লোগান তোলে এবং 'দেশের শত্রু' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। ২০১৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ঘটনা ঘটে, যেখানে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা ভারতের জাতীয় পতাকা পোড়ায়। এই ঘটনাটিতে সমালোচনায় মুখর হয় সারা দেশ। এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসে ভারতের সংবিধান ও জাতীয় পতাকার প্রতি বামপন্থীদের তীব্র ঘৃণা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই ঘটনাগুলি ঘটে চললেও প্রশাসন যথারীতি নির্বিকার।

বাম ও অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন ফোরাম ব্যবহার করে। তারা প্রায়ই নানা সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে, যেখানে তারা ভারতের সংবিধান ও জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। ভারতের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে কুকুর, গণশত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে।

দেশবিরোধিতা ছাড়াও বাম অধ্যুষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অতিবাম ছাত্রনেতৃত্বের অত্যাচার, রাজনৈতিক হামলা, র‍্যাগিং, মাদক পাচার ও যৌন চক্রের এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হলো পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা শুধুমাত্র তার শিক্ষাগত মানের জন্য নয়, বরং তার ছাত্র আন্দোলনের জন্যও বিখ্যাত। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি অন্ধকারময় দিকও রয়েছে, যা একশ্রেণীর বাম ছাত্র ও অধ্যাপকদের যোগসাজসে দশকের পর দশক ধরে চলছে। বাম ও অতিবাম ছাত্র নেতৃত্বের সন্ত্রাস, নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর তাদের নৃশংস র‍্যাগিং ও বুলিং, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপর আক্রমণ, মাদক চক্র, যৌন চক্র ও নারী পাচারের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবাম ছাত্রনেতৃত্বের অত্যাচার, রাজনৈতিক হামলা, র‍্যাগিং, মাদক ও যৌন চক্রের ঘটনাগুলি নিম্নরূপ :

অতিবাম ছাত্রনেতৃত্বের উত্থান ও একাধিপত্য : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলির উত্থান মূলত ১৯৬০-'৭০-এর দশকে শুরু হয়। সেই সময় সারা দেশজুড়ে নকশাল ও বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উত্থান এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রভাব পড়ে এবং ছাত্র সংগঠনগুলি বামপন্থী আদর্শ জারিত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনগুলি সামাজিক ন্যায়, শিক্ষার অধিকার ও শ্রেণীসংগ্রামের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও ধীরে ধীরে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অত্যাচারের দিকে মোড় নেয়। ছাত্র সংগঠনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে এবং তাদের আদর্শের বিরোধী যেকোনো মতামতকে দমনে উদ্যত হয়।

উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনই শুধু নন, ধারাবাহিকভাবে ধ্বংসাত্মক বাম ও অতিবাম বিচারধারায় সম্পৃক্ত ছাত্র সংগঠনগুলির ঘৃণ্য আক্রমণের শিকার হয়েছেন ছাত্র-শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে অধ্যক্ষ, উপাচার্য, আচার্য, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্যপাল (অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য), শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপর হামলার ঘটনাগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গিয়েছে।

(১) রাজ্যপাল বা আচার্যের উপর হামলা : ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল এমকে নারায়ণন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসেন। কিন্তু অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলি তাঁর উপস্থিতির বিরোধিতা করে তাঁর উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় রাজ্যপালের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের উপরেও আক্রমণ চালানো হয়।

(২) রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলা : ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসেন। এই সময় অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলি তার উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

(৩) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলা : ২০১৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে বাম ও অতিবাম ছাত্ররা তার উপর হামলা চালায়।

(৪) রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলা (২০২৫) : গত ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার একটি কর্মসূচিতে যোগদান করলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে তাকে ঘেরাও করে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্ররা। তার গাড়ি ঘিরে ধরে চলে ধর্না ও বিক্ষোভ। এই ভিড়ের মধ্যে তার গাড়ি এগিয়ে গেলে আরবান নকশাল ছাত্র নেতা ইন্দ্রানুজ রায় গাড়ির ধাক্কায় আহত হয় বলে অভিযোগ করে।

নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর র‍্যাগিং ও বুলিং : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর র‍্যাগিং ও বুলিং একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এই অমানবিক আচরণের শিকার হয়। র‍্যাগিঙের নামে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই নির্যাতনের

মধ্যে রয়েছে কটূক্তি, নোংরা গালিগালাজ, অপমান, শারীরিক আক্রমণ ও যৌন হয়রানি।

(১) ২০০৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নবাগত ছাত্রকে র‍্যাগিঙের নামে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় ছাত্রটি গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

(২) ২০১২ সালে একজন নবাগত ছাত্রীকে র‍্যাগিঙের নামে যৌন হয়রানি করা হয়। এই ঘটনায় এই ছাত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান।

(৩) ২০২০ সালে একজন নবাগত ছাত্রকে র‍্যাগিঙের নামে মাদক সেবন করতে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনায় ছাত্রটি মাদকের প্রভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক সেবন ও নানা প্রকার নেশার অপসংস্কৃতি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক সেবন ও নেশার অপসংস্কৃতি একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলি এই মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদক বিক্রি করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিষিদ্ধ মাদক সেবনে উৎসাহিত করে।

(১) ২০১৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাদক চোরাচালান চক্রের পর্দাফাঁস হয়। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল অতিবাম চাত্র সংগঠনের নেতারা। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদক বিক্রি করত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক সেবনে বাধ্য করত।

(২) ২০১৮ সালে একজন ছাত্রকে মাদক সেবনের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। গুরুতর অসুস্থ ছাত্রটির পরিবার এই ঘটনার জন্য অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলিকে দায়ী করে।

(৩) ২০২১ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাদক চক্র ধরা পড়ে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল অতিবাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

যৌন চক্র ও নারী পাচার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতন ও নারী পাচারের ঘটনাও ঘটেছে। বিভিন্ন তদন্তে জানা যায় যে, ছাত্র নামধারী কয়েকজন এই যৌন নিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যৌন চক্র চালাত এবং ছাত্রীদের সেই যৌন চক্রের ফাঁদে জড়াত।

(১) ২০০৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি যৌন চক্র ধরা পড়ে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

(২) ২০১৬ সালে একজন ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এই ঘটনায় ওই ছাত্রীটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান।

(৩) ২০২২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যৌনচক্রের অভিযোগ ওঠে।

(৪) ২০২২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে অতিবাম ছাত্র নেতাদের হাতে বীভৎস র‍্যাগিঙের শিকার হন। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট তাঁকে সারা রাত ধরে নগ্ন করে নির্যাতন চালানো হয়। র‍্যাগিঙের শিকার হয়ে সেই রাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তথাকথিত প্রগতিশীল এলজিবিটি আন্দোলনের প্রবক্তা বাম ও অতিবাম নেতাদের হাতে নির্যাতিত স্বপ্নদীপ মৃত্যুর আগে চিৎকার করে বলেছিল— 'আমি সমকামী নই!'

অতিবাম ছাত্র নেতৃত্বের অত্যাচার ও একাধিপত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাম ছাত্র নেতৃত্বের অত্যাচার ও একাধিপত্য একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে এবং যারা তাদের আদর্শের বিরোধিতা করে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ :

২০০৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে ছাত্র সংগঠনগুলির বিরোধিতা করার কারণে প্রকাশ্যে হেনস্থা করা হয়। শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ২০১৪ সালে এক ছাত্র এবং ২০২২ সালে এক শিক্ষকও একই ঘটনার শিকার হয়।

সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাম ছাত্রদের অত্যাচার, র‍্যাগিং, মাদক চক্র ও যৌনাচারের প্রভাব সমাজ ও রাজনীতিতেও পড়েছে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে মানুষ তাদের মত প্রকাশ করতেও ভয় পায়, যা বাস্তবে গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজনৈতিক দল ও এই সংগঠনগুলির অনবরত বিভিন্ন আন্দোলন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা এই সব অসামাজিক কার্যকলাপ দশকের পর দশক ধরে চলছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ, প্রশাসনিক কাজকর্ম মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সমাধানে সঠিক ও কঠোর পদক্ষেপ ও নীতির প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পাশাপাশি সরকার ও সমাজকেও এর সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতিবাম— দুই গোষ্ঠীর প্রভাবই ব্যাপক। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে শিক্ষাঙ্গন অস্থির করে তুলেছে। অস্ত্র ব্যবহার ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত থাকার খবরও পাওয়া যায়। তারা প্রায়ই ধর্মঘট ডাকে, ক্লাস বন্ধ করে দেয়। বাকি ছাত্রদের পড়াশোনা ব্যাহত হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

প্রতিরোধ কোন পথে?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সারা দেশের সেরা মেধাকে খুব অল্প ফিজে পড়ানো হয়। কিন্তু দেশবিরোধী উগ্র মাও ও নকশালবাদীদের দ্বারা দেশের সেরা মেধা গণতন্ত্রবিরোধী দেশবিরোধী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অবিলম্বে অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মাধ্যমে এই গোষ্ঠী ও তার সদস্যদের উপর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অবিলম্বে ছাত্র সংগঠনগুলির নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফেরাতে হবে।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে এবং হোস্টেল-সহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসাতে হবে।

এনআইএ-সহ রাষ্ট্রসুরক্ষায় যুক্ত তদন্তকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশবিরোধী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, শহুরে নকশালবাদী রিক্রুটমেন্টের আঁতুড়ঘরে নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। ছাত্র পরিচয়ে রাষ্ট্রবিরোধী ও অসামাজিক কার্যকলাপের কারবারীদের সনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তবেই বিদেশি মদতপুষ্ট ছাত্রভেকধারী দেশের শত্রুদের হাত থেকে দেশের ও মুখ্যত বঙ্গের সেরা মেধাবী ছাত্রদের বিপথগামী হওয়া আটকানো যাবে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। □

পলাশপুরের গাজন মেলায়

স্কুল ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে নদীর দিকে রওনা হলো তিন বন্ধু। দোকান থেকে ছোলাভাজা আর মুড়ি কিনে নিয়ে নিল। নদীর পাড়ে বসে ছোলা-মুড়ি খেতে খেতে গল্প চলতে থাকলো। নদীতে জল তেমন নাই, কোথাও এক হাঁটু আর কোথাও এক কোমর। নৌকাগুলো বালু চরে পড়ে আছে। শিমুলতলার ঘাট দিয়ে দলে দলে লোকজন পলাশপুরে যাচ্ছে। আজকে থেকে

গাজনের মেলা শুরু। সবাই ওদিকেই যাচ্ছে।

সঞ্জয় বলল ওপাড়ে যাবি নাকি? রতন বলল, যাওয়ার তো ইচ্ছা করছে কিন্তু বাড়িতে না বলে গেলে বকাবকি করবে। গোবিন্দ বলে ওঠে, চল তো, তাড়াতাড়ি চলে আসবো। সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট থেকে বালি ঝেড়ে রতনকে জোর করেই তুলে দিল। ব্যাস আর কী! কোনো উপায় না দেখে রতনকে যেতেই হলো।

নদীর জল কিছুটা গরম। কিন্তু একটু এগোতেই জলটা ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। বেশ ভালোই লাগছে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে। হাঁটুর উপর পর্যন্ত প্যান্টটা তুলেও অনেকটাই ভিজে গেল। ওপাড়ে গিয়ে অনেকটা রাস্তা বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হলো। কিছুটা খাড়া বাঁধের মতো জায়গা পেরিয়েই শিবমন্দিরের চূড়াটা দেখা গেল। ওখানেই মেলা বসেছে। অনেক লোক হয়েছে। কত রকমের দোকান বসেছে। পাঁপড় ভাজা, জিলিপি, গজা, চপ, সিঙারা কত রকমের খাবার দোকান। মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কড়াই, কাঠের জিনিস, লোহার জিনিসপত্র।

একদল সন্ন্যাসী মন্দিরের পাশেই বটতলায় জমা হয়েছে। কেউ ধুনো জ্বালিয়ে বসে আছে, কেউ আবার ত্রিশূল, খাঁড়া নিয়ে নাচানাচি করছে। ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে শিব-কালীর নাচ চলছে। একজন আবার মড়ার খুলি নিয়ে ভিক্ষে করছে।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এক জায়গায় লোহার রিং ছুঁড়ে বিভিন্ন জিনিস জেতা যাচ্ছে। সঞ্জয় একটা মগ আর একটা বিস্কুট জিতল। বিস্কুটটা খেতে খেতে আবার নদীর দিকে রওনা হতেই আকাশের দিকে নজর গেল। আকাশের পশ্চিম দিকে ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝোড়ো হাওয়া শুরু হলো। নদীর ধারে একটা আমগাছের নিচে তেলেভাজার দোকানে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। দোকান থেকে চপ নিয়ে মুখে দিতে না দিতেই একটা লোক দৌড়াতে দৌড়াতে দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল। রতনের হাত থেকে চপটা পড়ে গেল। মুখেরটা মুখেই আটকে গেল। আধা ভেজা টাকমাথা লোকটা যে রতনের বাবা। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই মেঘ গর্জন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে রতন কেঁদে ফেলল। বৃষ্টিটাও জোর শুরু হলো।

রতনের বাবা কিছুই বললেন না, গামছা দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে শুধু বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকলেন। দুজনের হাতের চপটা মুখে কোনো রকমে ঢুকল খাওয়াটা ঠিক হলো না। বৃষ্টি কিছুটা কমতেই রতন দোকান থেকে নদীর দিকে দৌড়াল। সঞ্জয়, গোবিন্দও পিছন পিছন দৌড়াতে শুরু করল। রতনের বাবা গামছা কাঁধে নিয়ে ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হলেন।

তাড়াহুড়োতে নদীতে পড়ে গোবিন্দ পুরো ভিজে গেল। নিজেদের গ্রামে ঢুকতেই যে যার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। রতন বাড়িতে ঢুকেই মাকে বলল তার খুব খিদে পেয়েছে। মা তাকে খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কীসের জন্য এত দেরি হলো। সে বলল পাশেই একটু ঘুরতে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য দেরি হয়ে গেছে।

তার মা বলল, তুই আগে আসলে ভালো হতো,তোর বাবা তোকে মেলায় নিয়ে যাবে বলছিল, কিন্তু তোর অপেক্ষা করতে করতে একাই বেরিয়ে গেল। এখন যা, গিয়ে পড়তে বস। রতন বলল আজকে খুব ঘুম পাচ্ছে কাল ভোরে উঠে পড়ব। মায়ের আর কোনো কথা শোনার অপেক্ষা না করেই ঠাকুমার বিছানায় ঢুকে পড়ল।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেন, কী রে দাদুভাই, এখনই ঘুম? রতন ঠাকুমাকে চুপ করে থাকার ইশারা করে মাথাটা চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। তখনই রতনের বাবা বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করেন, রতন কোথায়? রতন ঠাকুমাকে বলে, ঠাকুমা বাঁচাও, বাবা আমাকে মারবে।

তোকে মারতে যাবে কেন রে দাদুভাই?

আমি মেলায় গেছিলাম আর বাবা দেখে ফেলেছে। এখন মারবে।

ঠাকুমা বাইরে গিয়ে কিছু বলতেই বাবা চুপ করে যায়। তারপর ঠাকুমাও বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঠাকুমা কী বললে গো বাবাকে? ফোকলা দাঁতে হাসি হেসে বলে, ও তোর বাবা হতে পারে কিন্তু আমি তো তোর বাবার মা। আমার সঙ্গে পারবে না। ও তো ছোটোবেলায় কতবার মেলা দেখতে, যাত্রা দেখতে গেছে প্রতিবারই তো আমার কাছে এসে তোর ঠাকুরদার মার থেকে বেঁচেছে। আর আমার দাদুভাইকে মারতে দেব নাকি?

—সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

ভিতরকণিকা

ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও জলাভূমি ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণী নদী ও বৈতরণী নদীর ব-দ্বীপে ৬৫০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এর পূর্ব দিকে রয়েছে গাহিরমাথা সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং গাহিরমাথা সমুদ্রতট ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ভিতরকণিকা অরণ্য ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জমিদারি বন ছিল, তারপরে সরকারি বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৭৫ সালে ৬৭২ বর্গ কিলোমিটার জায়গা ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা হয়। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে অভয়ারণ্যের কেন্দ্রীয় ১৪৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। ২০০২ সালে ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভকে রামসার জলাভূমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই অঞ্চলে নোনাজলের কুমির, কিং কোবরা, অজগর, কালো আইবিস, বন্য শুয়োর, রিসাস বানর, চিতল, ডার্টার, বড়ো গোসাপ রয়েছে। এছাড়া ২৬৩ পাখির প্রজাতির রেকর্ড পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৪৭টি প্রজাতি আবাসিক বাকি পরিযায়ী শ্রেণীর।

এসো সংস্কৃত শিখি-৬০

অস্তি----সন্তি

আছে (একবচনে)---- আছে (বহুবচনে)

বালক: অস্তি। বালকা: সন্তি।

বালক আছে। বালকেরা আছে।

অভ্যাসং কুর্ম:--

চষক: অস্তি। চষকা: সন্তি।

বালিকা অস্তি। বালিকা: সন্তি।

ফলম্ অস্তি। ফলানি সন্তি।

জননী অস্তি। জনন্য: সন্তি।

লেখনী অস্তি। লেখন্য: সন্তি।

দণ্ড: অস্তি। দণ্ডা: সন্তি।

পত্রিকা:অস্তি। পত্রিকা: সন্তি।

প্রয়োগং কুর্ম:

ছাত্র: ছাত্রা:, দেব: দেবা:, দেবী দেব্য:, নারী নার্য:, যুতকম্ যুতকানি।

ভালো কথা

জঙ্গলে একদিন

গত রবিবার আমরা সকলে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে ঘুরতে যায়। সকালে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে ঝাড়গ্রাম পৌঁছায়, তারপর সেখান থেকে গাড়ি করে বেলপাহাড়ি। রাস্তাতেই জলখাবার খেয়ে নিই। দুধারে শাল, শিমুল, পলাশ, করম গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুন্দর রাস্তা দিয়ে আমরা একটা রিসর্টে পৌঁছায়। পাশেই আবার কাজু বাগান। সেখানে স্নান, খাওয়া সেরে ঘুরতে বেরায়। কাঁকড়াঝোড়ে পাহাড়ি এলাকা যেন স্বর্গের মতো সুন্দর। রাস্তার ধারে একটা মাটির সুন্দর বাড়িতে একটা ময়ূর আর একটা ময়ূরী দেখতে পেলাম, ছবিও তুললাম। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথে একটা জায়গায় গাড়ি হঠাত দাঁড়িয়ে পড়ল আর পাশেই দেখি একদল হাতি। একদিনে এতকিছু দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি, একেবারে অসাধারণ।

অংশুমান সরকার, হাওড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) প্র ফ তি ল	(১) রে দি স্ত খা গ
(২) কা স বে ল	(২) সা হি ত গ লো র

১০ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অনুমোদন (২) অনন্তকাল

১০ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অনধিকারপ্রবেশ (২) কোলাহলমুখরিত

উত্তরদাতার নাম

(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, মকদমপুর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তিত হয়ে হলো বিজয় দুর্গ

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য

সম্প্রতি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এর নতুন নাম হলো— বিজয় দুর্গ। এটি কলকাতার হেস্টিংস এলাকায় অবস্থিত একটি দুর্গ। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে এই দুর্গটি নির্মিত হয়। এটি গঙ্গার প্রধান শাখা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। বোম্বে (মুম্বই) ও মাদ্রাজ (চেন্নাই)-সহ কলকাতায় ব্রিটিশ নির্মিত দীর্ঘস্থায়ী, সামরিক দুর্গগুলির মধ্যে একটি হলো এই ফোর্ট উইলিয়াম যা সত্তর হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

ব্রিটিশরা দুর্গটির নামকরণ করেছিল ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে। দুর্গের সামনে ময়দান, যা হলো দেশের বৃহত্তম পার্ক। দুর্গের ভিতরে রয়েছে একটি প্রহরী কক্ষ। শোনা যায় যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ব্রিটিশ সেনাদের সেই কক্ষে কারাবন্দি করেন। তার ফলে সেই কক্ষে অন্তরীণ ব্রিটিশ সেনাদের মৃত্যু ঘটে। ইতিহাসের পাতায় এই অধ্যায়টি অন্ধকূপ হত্যা বা ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি হিসেবে পরিচিত। এই দুর্গটি আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন (পূর্ব) কমান্ডের সদর দপ্তর।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, 'কলকাতার প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তর, তার নাম পরিবর্তন করে বিজয় দুর্গ রাখা হয়েছে।' তিনি জানান যে, দুর্গের ভিতরে আরও কিছু স্থাপত্যের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে অবস্থিত 'কিচেনার হাইস'-এর নাম পরিবর্তন করে মানেকশ' হাউস রাখা হয়েছে, এবং দক্ষিণ গেট, যা সেন্ট জর্জ গেট নামেও পরিচিত, তার নামকরণ করা হয়েছে— 'শিবাজী গেট'।

চার্লস আয়ারের উত্তরসূরী ব্রিটিশ আধিকারিক জন বিয়ার্ড ১৭০১ সালে এই দুর্গের উত্তর-পূর্বের টাওয়ারটি নির্মাণ করান এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সরকারি ভবনটি ১৭০২ সালে নির্মিত হয়। দুর্গের মূল কাঠামো ছিল একটি দ্বিতল ভবন যার একটি বহির্গামী এক্সটেনশন এবং একটি অভ্যন্তরীণ প্রহরী কক্ষ ছিল। ১৭৫৬ সালে বাঙ্গলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে বন্দি হয়ে বহু ব্রিটিশ সৈন্য এই প্রহরী কক্ষটিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা দাবি করে যে, এই কক্ষেই সংঘটিত হয় অন্ধকূপ হত্যা।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের একটি উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন যে, ১৭৭.২ একরেরও বেশি জমির উপর অবস্থিত এই দুর্গটি ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যরা ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে, বর্তমান দুর্গটি মূল ফোর্ট উইলিয়ামের স্থলে পুনর্নির্মাণ করায় ব্রিটিশরা। জন হলওয়েলের মতে, ১৪৬ জন যুদ্ধবন্দিকে ধরে রাতভর গার্ড রুমে (প্রহরী কক্ষে) আটকে রাখা হয়েছিল। ৪.৩০ মিটার × ৫.৫০ মিটার (১৪ ফুট × ১৮ ফুট) মাপের একটি কারাগার ছিল এই প্রহরী কক্ষ। ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরোধ ও তাপপ্রবাহে মারা যায়। সকাল ৬টায় কারাগারটির দরজা খোলার সময় ২৩ জন বন্দি জীবিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর, পুরনো দুর্গ নির্মাণের বিভিন ভুল-ত্রুটিগুলি বুঝতে পেরে, ১৭৫৮ সালে রবার্ট ক্লাইভ দুর্গটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন এবং নতুন দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭৬৬ সালে পুরনো দুর্গটি মেরামত করে পুনরায় খোলা হয় এবং শুল্ক ভবন হিসেবে দুর্গটিকে ব্যবহার করা হতে থাকে। ময়দানে নির্মিত নতুন দুর্গটিরও একই নামকরণ করা হয়।

১৭৫৮ সালে ব্রিটিশরা নতুনভাবে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে এবং ১৭৮১ সালে প্রথম পর্যায়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ইস্টার্ন কমান্ডের সেনা আধিকারিক জানান যে, 'পুরনো কাঠামোটি ধ্বংস হওয়ার পর, ব্রিটিশরা উন্নততর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সব নতুন দুর্গটি নির্মাণ করে। দুর্গটি ইট এবং চুন-বালি-জল মিশিয়ে প্রস্তুত ইট গাঁথার আঠা বা মর্টার দিয়ে তৈরি। দুর্গটি একটি অনিয়মিত অষ্টভুজের আকৃতিসম্পন্ন, যাক আয়তন ৫

ফঃ ৬

বর্গকিলোমিটার (১.৯ বর্গমাইল)। দুর্গের প্রাচীরগুলি আগুন সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। অষ্টভুজাকার কাঠামোটির চারপাশে একটি পরিখা রয়েছে। ৯ মিটার (৩০ ফুট) গভীর এবং ১৫ মিটার (৪৯ ফুট) প্রশস্ত এই শুকনো পরিখাটি দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছে। পরিখাটি বৃষ্টির জলে প্লাবিত হতে পারে, তবে এটিকে এমন একটি এলাকা হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দুর্গ আক্রমণকারীরা দুর্গ প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে। দুর্গের মধ্যে আটটি দরজা ছিল। এর মধ্যে তিনটি হুগলী নদীর দিকে মুখ করে ছিল, যার তীরে দুর্গটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যগুলি খোলা জমির ধারে ছিল। এই খোলা জমিটি আজ কলকাতা ময়দান নামে পরিচিত'।

বর্তমানে এই দুর্গের ছয়টি দরজা খোলা রয়েছে। প্রশাসনিক কারণে দুটি দরজা বন্ধ রয়েছে। খোলা দরজাগুলি হলো— চৌরঙ্গী, পলাশী, কলকাতা, ওয়াটার গেট, শিবাজী (পূর্বতন সেন্ট জর্জ) ও ট্রেজারি গেট। কেরালার কন্নুরের থালাসেরিতে একই রকম একটি দুর্গ রয়েছে।

সেনা আধিকারিক বলেন যে, দুর্গের প্রাচীর বরাবর ৪৯৭টি কামান স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্গে কেউ কখনো আক্রমণ না করায় তাদের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাবারুদ চালাতে হয়নি। ফোর্ট উইলিয়াম বিশ্বের একমাত্র দুর্গ যেখান থেকে কখনো একটিও গুলি চালানো হয়নি। ঐতিহাসিক কিচেনার হাউসটি ১৭৭১ সালে ফোর্ট অ্যাসল্ট কোম্পানির ব্লকহাউস হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। ১৭৮৪ সালে এটি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফের বাসভবনে রূপান্তরিত হয় এবং ফিল্ড মার্শাল হোরাশিও হারবার্ট কিচেনারের নামে এর নামকরণ করা হয়। কিচেনার ১৯০২ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এখানে বসবাস করেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ'র নামে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। সেই বছরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ভারতীয় সেনা জয়লাভ করে, এবং এর ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য-সহ আত্মসমর্পণ করেন। তাকে প্রাথমিকভাবে কিচেনার হাউসে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর দুর্গটির মধ্যে নির্মিত হয়েছে অনেক নতুন স্থাপত্য। দুর্গের ভিতরে নয়টি গর্ত-বিশিষ্ট একটি গলফ্ কোর্সও বিদ্যমান। দুর্গটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পত্তি। এটি পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের দপ্তর হওয়ায়, দুর্গটি একটি বক্সিং রিং, একটি সুইমিং পুল, ফায়ারিং রেঞ্জ, রেস্তোরাঁ, একটি ক্লাব হাউস, বহিরাঙ্গনে একটি খেলার মাঠ, একটি শপিং কমপ্লেক্স, লন্ড্রি, একটি সিনেমা হল এবং একটি ডাকঘরের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবস্থা দ্বারা সজ্জিত। এছাড়াও, দুর্গটিতে একটি অস্ত্রাগারও রয়েছে।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের নামে সেন্ট জর্জ গেটের নামকরণ করাও অযৌক্তিক নয়। মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ উপকূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের নামও বিজয় দুর্গ। এটি ছিল মরাঠাদের নৌঘাঁটি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পত্তি কলকাতার বিজয় দুর্গ। ইস্টার্ন কমান্ডের এই সদর দপ্তরে ১০,০০০ সেনাকর্মীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এটির কড়া পাহারায় মোতায়েন রয়েছে ভারতীয় সেনা। অসামরিক নাগরিকদের প্রবেশাধিকার এখানে নেই। ১৯৬৩ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে পূর্বতন ফোর্ট উইলিয়াম, বর্তমান বিজয় দুর্গেই ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরটি অবস্থিত।

এই দুর্গের বেশিরভাগ অংশ অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে সেন্ট পিটার্স চার্চ, যা কলকাতার বাসিন্দা ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য একটি চার্চ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, বর্তমানে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। দুর্গের প্রবেশপথে একটি যুদ্ধ স্মারক (ওয়ার মেমোরিয়াল) নির্মিত হয়েছে। দুর্গের ভিতরে একটি জাদুঘরও রয়েছে যেকানে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নিদর্শনগুলি, বিশেষত পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। □

ADMISSIONS OPEN 2025

NIBEDITA VIDYAMANDIR

English Medium School

Based on CBSE board curriculam and NEP 2020

Under : Nibedita Seba Trust, Medinipur

Kalikanagar, Gourhari Bhaban (Ramakrishna Nagar Park, East side), Dharma, Paschim Medinipur)

ADMISSIONS (AGE OF THE CHILD) :

(Play Group)	:	2-3 Years
(Nursery)	:	3-4 Years
(Jr. K. G.)	:	4-5 Years
(Sr. K. G.)	:	5-6 Yeras

Mob. : 9932620399, 7001369911, 7407269744

Physical, Mental, Intellectual, moral and spiritual development of children is our motto.

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অগ্রাধিকার ত্রিভাষা সূত্রের মাধ্যমে শক্তিশালী ভারত নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপকদের সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ বা এবিআরএসএম-এর পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সংগঠনটির অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করা হয়েছে। 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং ত্রিভাষা সূত্রের মাধ্যমে শক্তিশালী ভারত নির্মাণ'-শীর্ষক প্রেস বিবৃতিতে এবিআরএসএম -এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সংগঠনটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শিক্ষাক্ষেত্র সর্বদাই রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত এবং জাতির উন্নয়নে একীভূত শক্তি হিসেবে এই ক্ষেত্রটির কাজ করা উচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি), ২০২০ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা একটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, যা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমূল রূপান্তরের লক্ষ্যে উপযোগী। তার সঙ্গে ভারতের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে। এবিআরএসএম সারা দেশে ত্রিভাষা সূত্র এবং জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র বাস্তবায়নের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানায়। ভারতীয় জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং জাতীয় ঐক্যকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে এবিআরএসএম। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র অন্তর্গত ত্রিভাষা সূত্র ভারতীয় ভাষাগুলির শিক্ষণের বিষয়টি তুলে ধরে, যার মাধ্যমে যেকোনো দুটি ভারতীয় ভাষা শেখানোর সুযোগ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা হতে পারে কোনো ভারতীয় বা বিদেশি ভাষা। এই নীতি বহুভাষিকতার উপর জোর দেয় এবং মাতৃভাষায় বা বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় ভায়ায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এবিআরএসএম-এর সভাপতি নারায়ণলাল গুপ্তা জানিয়েছেন যে, ভাষাগত বৈচিত্র্য হলো ভারতের প্রাণবন্ত ও বর্ণময় সামাজিক কাঠামোর মূল শক্তি, যা যথাযথভাবে তুলে ধরে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০। তিনি জানান যে, ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি কারুর উপর কোনো ভাষাকে চাপিয়ে দেয় না, বরং আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষাগুলির প্রশিক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি ও দেশ জুড়ে শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চিত করে এই শিক্ষানীতি।

এবিআরএসএম-এর সাধারাণ সম্পাদক প্রফেসর গীতা ভট্ট বলেছেন, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র বিরোধিতা করছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই শিক্ষানীতি প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন যে, অনেক অ-বিজেপি দল শাসিত রাজ্য বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র সুবিধাগুলিকে স্বীকার করে এর কিছু উপাদানকে গ্রহণ করেছে। তাই এই নতুন শিক্ষানীতির বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রচলিত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজমের) ভাবনাটিকে এই দলগুলির অনুচিত।

ভারতের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও তাদের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে এবিআরএসএম। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কাশী-তামিল সঙ্গম এবং সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমের বিষয়টিরও উল্লেখ করেছে এবিআরএসএম। সরকারি তরফে এই প্রচেষ্টাগুলি তামিলনাড়ু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিতকে সুদৃঢ় করে।

এর পাশাপাশি 'লিঙ্গুইস্টিক ইনক্লুসিভিটি' বা শিক্ষাক্ষেত্রে সকল ভাষা শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতিটিকেও বাস্তবায়িত করে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র সমর্থনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সবক'টি পক্ষকে এই প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছে বলেও জানিয়েছে এবিআরএসএম। শিক্ষাকে রাজনীতির বিষয়ে পরিণত করা বা সেই গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। শিক্ষাকে জাতির জ্ঞান আহরণ, ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অগ্রগতির একটি হাতিয়ারে পরিণত করার পক্ষে এবিআরএসএম রয়েছে বলে এই প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে। □

নাগপুর হিংসার নিন্দা, দোষীদের শাস্তির দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৮ মার্চ বিশ্ব হিন্দুপরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী মিলিন্দ পরাণ্ডে গত ১৭ মার্চ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হিংসার কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। এই সঙ্গে তিনি গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে সংঘটিত এই হিংসায় যুক্ত জেহাদিদের, গুজব রটনাকারীদের এবং হিন্দুদের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের কবরের জায়গায় বীর ধনাজী জাধব, সন্তাজী ঘোরপড়ে, ছত্রপতি রাজারাম মহারাজের স্মৃতি স্মারক এবং মরাঠাদের দ্বারা মুঘলদের পরাজিত করার ইতিহাস তুলে ধরতে এই স্থানে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। নাগপুরে জেহাদিদের আক্রমণের ঘটনা ও তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন যে, গত ১৭ মার্চ রাত্রিতে নাগপুরে যে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনা জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তা চরম নিন্দনীয়। পরিষদের যুব বিভাগ— বজরঙ্গ দলের কার্যকর্তাদের উপর এদিন হামলা হয়েছে। জেহাদিরা হিন্দুদের অনেকগুলি বাড়িতে আক্রমণ করে এবং মহিলাদের উপরেও নির্যাতন চালায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর ঘোর নিন্দা করে। এছাড়াও তিনি দাবি জানান, যে বা যারা এই অশান্তির উসকানিতে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। নাগপুরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি অত্যন্ত লজ্জার। প্রথমে একটি মিথ্যে বা গুজব রটিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারপর হিংসায় উসকানি দিতে একটি কুৎসিত প্রচেষ্টা চালানো হয়। যারা এই ধরনের কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। হিংসা যারা ছড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ধারা আরোপ করে শাস্তির দাবিতে তিনি সরব হন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী।

এছাড়াও তিনি জানান যে, ছত্রপতি সম্ভাজীনগরে ঔরঙ্গজেবের যে কবর রয়েছে তার মহিমাকীর্তন বন্ধ হওয়া দরকার। বরং ওই স্থানে ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করা মরাঠি সেনানায়ক ধনাজী জাধব, সন্তাজী ঘোরপড়ে, ছত্রপতি রাজারামজী মহারাজের একটি বিরাট স্মৃতি স্মারক নির্মিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই জায়গাটিতেই মরাঠা বীর যোদ্ধারা মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করেছিলেন। তাই এই স্থানে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপনের দাবি জানাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে আগামী ১৪, ২১ ও ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। এই তিনটি বিশেষ সংখ্যায় সঙ্ঘের তথা বিবিধ ক্ষেত্রের দেশব্যাপী কার্যকলাপ ও কার্যবৃদ্ধির সম্পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ করা হবে।

দাম একই থাকছে ১৬.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন। কমপক্ষে ১০ কপি নিলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

—ব্যবস্থা বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

শোক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোচরণ শাখার স্বয়ংসেবক নরেন্দ্রনাথ সরদারের সহধর্মিণী ললিতা সরদার গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ কন্যা ও ২ নাতিকে রেখে গেছেন।

* * *

হুগলী জেলার কাপাসডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক জয়দেব কর্মকারের সহধর্মিণী টিংকু (জয়া) গত ১১ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

* * *

হুগলী জেলার কাপাসডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক সজল দাসের মা রেখা দাস গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হুগলী জেলার কাপাসডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক অরুণ রায়ের মা সন্ধ্যা রায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

আমার দেখা সঙ্ঘের প্রচারক অমল ঘোষ

জয়রাম মণ্ডল।। আমি তখন বাঁকুড়া জেলার আন্দারথোল শাখার মুখ্যশিক্ষক। স্নাতক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। অনেক দিনের বাসনা ছিল সঙ্ঘের কাজে একবার বিস্তারক বের হবো। আমাদের বাড়িতে বাঁকুড়া জেলার সব স্তরের কার্যকর্তা ও প্রচারকদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সঙ্ঘকাজে সময় দেবার মন তৈরি হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালে বিস্তারকের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম খাতড়া মহকুমার বনতিল্লা গ্রামে এক মাসের বিস্তারক। ওই সময় বাঁকুড়া জেলার জেলাপ্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডল এবং মহকুমা প্রচারক অমল ঘোষ। অমলদার চেহারা ছিল গাট্টাগোট্টা। কালো চশমা ব্যবহার করতেন। হাসিখুশি, সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন। খাতড়া থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে আন্দারথোল গ্রাম। প্রতি মাসে সাইকেলে করে আমাদের আন্দারথোল শাখায় আসতেন। শাখায় ভালো খেলা নিতেন। আন্দারথোলে রাত্রিবাস মানে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে বাড়ির সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

দেখতে দেখতে বনতিল্লা গ্রামের শাখায় এক মাস বিস্তারক থাকা হয়ে গেল। সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক হলো। ওই গ্রামের আমিও সবার প্রিয় হয়ে উঠলাম। সেই সময় অমলদাকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। অমলদার বাড়িতে যাওয়া, হাসনাবাদে থাকার সুযোগও কয়েকদিন হয়েছিল। বাংলাদেশের বর্ডারও দেখলাম। কিন্তু অমলদাকে কার্যক্ষেত্রে সাইকেলে চেপে চরকির মতো ঘোরা এ এক বিশাল অনুভব। পরিশ্রমে খামতি নেই। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে চলে যাচ্ছেন। পাহাড়ি রাস্তায় সাইকেলে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম। তবুও অমলদার মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকতো। একটু বেশি বয়সে সরকারি কাজ ছেড়ে সঙ্ঘের প্রচারক হয়েছেন। তার ফলে সেই সময় খাতড়া মহকুমায় সঙ্ঘের কাজের বিস্তারও হয়েছেন। তখনকার কয়েকজন বালক স্বয়ংসেবক ওই মহকুমা থেকে বেরিয়ে অনেক বড়ো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। অমলদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাতের তৈরি স্বয়ংসেবক অনেকজন প্রচারক বেরিয়ে বড়ো বড়ো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন, এমন উত্তম মাহাতো, জলধর মাহাতো, পঙ্কজ মণ্ডল উল্লেখযোগ্য নাম। এখন আপনার কেমন লাগছে? তিনি হাসতেন, আর বলতেন, এটাইতো সঙ্ঘের কাজ। দুধ থেকে মাখন তৈরি করা।

শেষ সময়টা বাড়িতেই ছিলেন। বড়ো পরিবার, ৩ ভাই, ৩ বোন। পরিবারের ছোটো অমলদা। দীর্ঘদিন সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। হাসনাবাদে ঘোষপাড়ায় বাড়ি। দীর্ঘদিন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। গত ১৬ মার্চ ইহলোকের কর্ম শেষ করে পরলোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ভাইপো, ভাইজীদের রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রচারক ছিলেন। নিজের অংশের পৈতৃক জমি বিক্রি করে ঝাড়গ্রাম কার্যালয় নির্মাণে দান করেছেন। খাতড়ায় শিশুমন্দির নির্মাণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নীলাদ্রিশেখর বসুর ৮৪তম জন্মদিবসকে স্মরণ করে

প্রবীর ভট্টাচার্য

ঢাক, ঢোল, করতাল, কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে কবিতা বলার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন নীলাদ্রিশেখর বসু। এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো নীলাদ্রিশেখরের নাম শোনেননি। শুনবেনই-বা কী করে? ইউটিউব, ফেসবুকের যুগ আসার অনেক আগেই পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন।

সে একটা সময় ছিল। কবিতার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেনদের মতো তারকা জনপ্রিয়তাকে পিছনে ফেলে আবৃত্তিকার হিসেবে উঠে এসেছেন কাজি সব্যসাচীর দুই ছাত্র প্রদীপ ঘোষ ও নীলাদ্রিশেখর বসু। এছাড়াও পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, কাজল চৌধুরী, শাওলি মিত্র, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণদের কবিতা শুনতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছে।

অসামান্য তাঁদের পরিবেশনা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই শুনতেন। নীলাদ্রিশেখরের মুখেই আমরা শুনেছি আবৃত্তি একটি স্বতন্ত্র শিল্প। আবৃত্তি নাটক নয়। বরং নির্দিষ্ট ছন্দে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করাই একজন আবৃত্তিকারের কাজ। তখন কবিতা বলা বা শেখার প্রতিষ্ঠান সেই অর্থে ছিল না। কয়েকজন ছাত্র নিয়ে নীলাদ্রি শেখর বসু প্রতিষ্ঠা করেছেন আবৃত্তি শিক্ষা ও চর্চাকেন্দ্র আবৃত্তি আকাদেমি। তিনি কবিতা পড়তে শেখাতেন, কবিতা বলতে শেখাতেন, উচ্চারণ শেখাতেন, কবিতার ব্যাকরণ শেখাতেন। আবার ছন্দ মেনে, কবিতার তাল মাত্রা বজায় রেখে মুখস্থ আউড়ে যাওয়াই যে আবৃত্তি নয়, কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে, কবিতার মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে, এই বোধ তৈরি করার মূল কারিগর তিনিই। আবৃত্তি শিল্পকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। আবৃত্তির স্বরলিপি করার চিন্তা করতেন। কবিতা বলা, তার ছন্দকে বোঝা, সঠিক উচ্চারণকে আয়ত্তে আনা, সর্বোপরি বাঙ্গালির প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠায় অধ্যয়ন করার এবং তার জন্য সম মনস্কদের জন্য একটি মঞ্চ তৈরির ভাবনায় প্রকাশ হতো 'বাল্মীকি স্মরণ' পত্রিকা। কবিতা, ছন্দ, ভাষা, উচ্চারণ, মঞ্চায়ন নিয়ে কী অসামান্য সব আলোচনা থাকত তাতে। আবৃত্তির প্রচার ও প্রসারে সর্বদা অক্লান্ত থাকতে বলতেন। কঠোর শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখতে চাইতেন আবৃত্তি আকাদেমির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে।

আবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এর প্রচার, প্রসারে সকল আবৃত্তিকারের সচেতন হওয়া উচিত। এ জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'আবৃত্তি আকাডেমি'। আদিকবি বাল্মীকির মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমাগমঃ ...শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শুরু হতো আবৃত্তি আকাদেমির প্রতিদিনের পথচলা। আবৃত্তি আকাদেমির প্রাক্তনী ও নীলাদ্রিশেখরের হাতে তৈরি কিছু শিক্ষার্থীর মিলিত আয়োজন 'আবৃত্তি আকাদেমি পরম্পরা' কলকাতার রবীন্দ্রসদন পরিসরে অবনীন্দ্র সভাগৃহে আয়োজন করেছিল 'গুরু প্রণাম' একটি স্মৃতিচারণ এবং আবৃত্তি সন্ধ্যা। তাঁর সান্নিধ্যে আসা কয়েকজন সন্তানতুল্যর তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন। কবিতায়, কথায় স্মৃতিচারণে অনেক পুরনো দিনের কথা সামনে নিয়ে এল। স্মৃতিচারণ ও কবিতায় অংশ নিয়েছিলেন নীলাদ্রিশেখরের পুত্র সৌম্যাদ্রিশেখর বসু, বিশিষ্ট আবৃত্তিরকার বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, সমীরণ সান্ন্যাল, রবীন কর্মকার, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ মিত্র, কিংশুক রায় চৌধুরী, এষা চক্রবর্তী, শম্পা সরকার প্রমুখ। 'সম্মেলক' আবৃত্তি পরিবেশন করে 'আলাপ' এই প্রজন্ম কিছু না চেয়েই অনেক কিছু পেয়েছে। কিন্তু তারা যা পায়নি, তার মধ্যে অবশ্যই একজন নীলাদ্রিশেখর বসু।

স্বামীজীর দুই ভাবশিষ্যের কথা

বিজয় আঢ্য ॥ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত 'ভারতের স্ব-ভাব'-এর কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। স্বামীজী ভারতীয় যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন— 'তোমাদের উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।' বস্তুত ত্যাগই ভারতের স্বভাব। স্বামীজীর দুই ভাবশিষ্য শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজেরাই একথা স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' এবং সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন'-ই তার সাক্ষ্য। একজন যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদের সূচনা করেছিলেন; অন্যজন সেই অগ্নিপথের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিক।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম (১৮৭২-১৯৫০) ও বড়ো হওয়া। বরোদার মহারাজা গাইকয়ারের আমন্ত্রণে তাঁর স্বদেশে ফেরা (১৮৯৩)। প্রথমে বরোদার মহারাজের নানারকম প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পরে বরোদা কলেজের অধ্যাপক। তখনকার কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন তিনি। ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসকে আড়াআড়ি ভেঙ্গে তৈরি করেছিলেন চরমপন্থী (Nationlalist) উপদল। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে তৈরি হলো 'লাল-বাল-পাল' ত্রয়ী জোট। দেশের মুক্তির ভাবনা তখন তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে। রাজনীতি, বিপ্লব, যোগ অনুশীলন, অধ্যাপনা, লেখালেখি— তাঁর হাতে তখন অনেক কাজ। তাঁর প্রেরণায় যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সহোদর বারীণ ঘোষ, সতীশচন্দ্র বোস, ব্যারিস্টার পি মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের মতো বিপ্লবী দলের কাজকর্ম খুব বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের

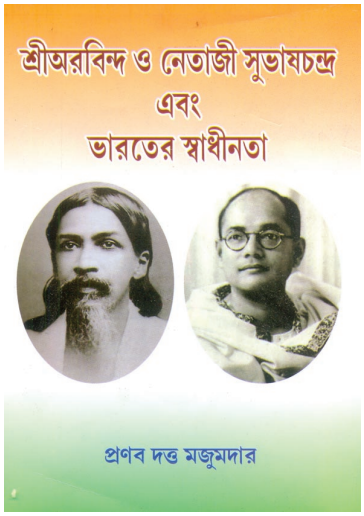

চক্রান্তের সিদ্ধান্তকে দেশের মুক্তি আন্দোলনের সুবর্ণ মুহূর্ত বুঝে তিনি যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হলেন।' বন্দেমাতরম হয়ে উঠল বিপ্লবী দলের মন্ত্র।

রাজদ্রোহিতার অপরাধে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে রাখা হলো আলিপুর জেলে। জেলখানার কুঠুরি শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনার গুহা হয়ে উঠল। তিনি লিখে গেছেন—ধ্যানরত অবস্থায় স্বামীজীর বাণী তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। পরে অবশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো। উত্তরপাড়া ভাষণের (১৯০৯) নির্যাস— সনাতন ধর্মই ভারতের আত্মা বা স্বভাব। এরপর পণ্ডিচেরীতে শুরু হলো তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক অধ্যায় (১৯১০-১৯৫০)। এখানেই তাঁর বৃহত্তর উপলব্ধি— বিশ্বগুরু হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেই হবে ভারতমাতার পূর্ণ মুক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের মতো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও (১৮৯৭-????) লিখেছেন— 'স্বামীজী ছিলেন পৌরুষ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিতাম।' স্বদেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতার চিন্তা এতটাই প্রখর ছিল যে ইংরেজের বড়ো চাকুরি ছেড়ে ১৯২১ সালে ভারতে ফিরে এলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-কে রাজনৈতিক গুরু হিসেবে মেনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তিনিও গান্ধীজীর তুষ্টীকরণ রাজনীতি পছন্দ করতে না পারায় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন (১৯৩৯)। যদিও তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি নির্বাচিত (১৯৩৮) হয়েছিলেন। এই সময় (১৯৩৯) বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি উপলব্ধি করলেন যে এখনই ইংরেজ সরকারকে আঘাতের উপযুক্ত সময় আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি দেশত্যাগ (১৬.০১.১৯৪১) করে রাশিয়া, জার্মান হয়ে জাপানে পৌঁছালেন। জাপানে কর্মরত মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে জাপানে পৌঁছে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' ও 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'— উভয়েরই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে আজাদ হিন্দ সরকার-ই হলো অখণ্ড ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার এবং সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৩-এ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আজাদ হিন্দ সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৪০-এ মণিপুরের মইরাং-এ আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিজয় পতাকা উড়ল। এর পরের ইতিহাস কম-বেশি জানা। তাঁর অন্তর্ধান (১৮.০৮.১৯৪৫) বা মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। লেখক দুই মলাটের মাঝে স্বামীজীর এই দুজন ভাবশিষ্যের জীবন ও কৃতিত্ব সংক্ষেপে কিন্তু যথাযথভাবে বর্ণনা করে প্রশংসার দাবি রাখেন।

পুস্তক : শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ভারতের স্বাধীনতা।
লেখক : প্রণব দত্ত মজুমদার।
তুহিনা প্রকাশনী। মূল্য : ১৭০ টাকা।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

সাত সমুদ্র পার থেকে এসে আমাদের দেশ দখল করে শাসন করবে আবার আমাদেরই উপরেই খবরদারি, বিধিনিষেধ! 'বন্দেমাতরম্' বলা যাবে না! শুরু হলো ছাত্রদের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ। মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শনে স্কুল ইন্সপেক্টর আসেন। ঠিক হলো এবার যখন ইন্সপেক্টর আসবে আর ক্লাসে ক্লাসে যাবে প্রত্যেক ক্লাসে সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া হবে। কে করলো, কে নেতৃত্ব দিল ঘুণাক্ষরে তা প্রকাশ করা চলবে না। প্রস্তুত হয়ে ছাত্ররা তখন দিন গুনছে। শীঘ্রই সুযোগ এসে গেল। নির্দিষ্ট দিনে প্রধান শিক্ষক জনার্দন বিনায়ক ওক এবং এক মুসলমান ইন্সপেক্টর চললেন ক্লাসের দিকে। প্রথম ক্লাসে ঢুকতেই যেন বিস্ফোরণ— সমবেত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো ক্লাসরুম। তাড়াতাড়ি হেড মাস্টারমশাই ইন্সপেক্টর সাহেবকে সেখান থেকে বের করে পরের ক্লাসে গেলেন। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। প্রধান শিক্ষক তো ঘাবড়ে গেলেন, এদিকে ছাত্ররা তো মহা উৎসাহিত। যে ক্লাসে যায় সেখানেই বন্দেমাতরমের এমন উদ্‌ঘোষ শেষ পর্যন্ত রেগে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। বিদ্যালয় পরিদর্শন এভাবেই শেষ হলো। এবার নির্দেশ এল কারা এই পরিকল্পনা করেছে তাদের নাম বের করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা মতো সবাই মৌন। জেরা করা হলো, ভয় দেখানো হলো, কাজ হলো না। শেষে জানানো হলো— নাম না বললে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। একথা শুনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল সবাই।

কেশবরাও হেডগেওয়ার এবং তার সঙ্গীরা এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য ডাঃ মুঞ্জে এবং দেশসেবক সংবাদপত্রের সম্পাদক অচ্যুত বলবন্ত কোলহট্‌করের সঙ্গে দেখা করেন। ঠিক সিদ্ধান্ত হলো যতদিন কোনোরকম শাস্তি ছাড়া ছাত্রদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না, ততদিন বিদ্যালয় বয়কট চলবে। শুরু হলো রাস্তায় ছাত্রদের ধরনা। নাগপুর জুড়ে জনসাধারণের মধ্যে যেন এক সাড়া পড়ে গেল। অভিভাবকদের সমর্থন থাকলেও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা তো ছিলই। এভাবে আন্দোলন চললো প্রায় দু' মাস। ছাত্ররা অনড়। শেষে বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিপিন কৃষ্ণ বোস, সর্বোদয় নেতা তাঁত্যাজী ওয়ঝলকর প্রমুখ এবং প্রধান শিক্ষক জনার্দন পন্ত ওক ছাত্রদের সঙ্গে বসে একটা পথ বের করলেন। অভিভাবক-সহ ছাত্ররা স্কুলে এলে অভিভাবকরা করবেন 'ভুল হয়ে গেছে তো।' ছাত্ররা শুধু ঘাড় নাড়িয়ে উত্তর দেবে— হ্যাঁ। এভাবে ইঙ্গিত করবে একে একে এই পদ্ধতি মেনে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করল শুধু দু'জন ছাড়া। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই দু'জনের মধ্যে একজন ছিল কেশব হেডগেওয়ার।

(সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস)

বন্দেমাতরম্

ব্রিটিশ পুলিশ এবার বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলো নাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। বঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এখানেও যে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা স্রোত তৈরি করেছে একথা তারা বেশ বুঝতে পারলো। আর এসব চিন্তার পেছনে বেশিরভাগ কিশোর তরুণ সমাজের সঙ্গে কিছু রাজনীতি সচেতন মানুষের মাথা কাজ করতো। অতএব এমন সবার উপরে প্রশাসনের দায় এসে পড়লো বেশি। শুরু হলো নিয়মের বিধিনিষেধ। কোথাও কোথাও সমবেত হওয়া সর্বজনীন কোনো কাজ তাদের পছন্দ ছিল না। শিবাজী জন্মোৎসব, গণপতি উৎসব, রামদাস নবমী ইত্যাদি পালন ও সেই সমারোহে অংশগ্রহণ ছিল এক দুঃসাহসের ব্যাপার। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ছিল আরও অপরাধের। কেউ স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র খুলতে চাইলে ভয়ে কেউ তাকে দোকান ভাড়া দিত না। তরুণরা একজায়গায় জড় হয়ে কোনো ব্যায়ামশালা বা আখড়া খুলতে চাইলে পুলিশের হুমকিতে বেশিদিন তা চলতো না।

আর এসব কর্মসূচি শোভাযাত্রা (বিক্ষোভ সমাবেশ 'বন্দেমাতরম্' রাষ্ট্রগান) করার উৎসাহ ছাত্রদের মধ্যেই বেশি দেখা যেত। তাই সরকার পক্ষ থেকে ছাত্রদের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হলো। সমস্ত স্কুলে সার্কুলার পাঠিয়ে শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হলো এমন বেয়াদব কোনো ছাত্র থাকলে তার নাম যেন সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এটাকেই বলা হতো কুখ্যাত 'রিসলে সার্কুলার'।

নাগপুরের নীলসিটি হাইস্কুলেও এই সার্কুলার এসে পৌঁছল। কেশবরাও হেডগেওয়ার তখন এই স্কুলেরই উঁচু ক্লাসের একজন ছাত্র। শুনে তো তার মাথায় একরকম আগুন জ্বলে উঠলো—